# মৃণালিনী

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পর্ষদ সংস্করণ, সংশোধিত ঊনবিংশ মুদ্রণ—মাঘ ১৪০৭
(পুস্তকাকারে প্রথম সংস্করণ মার্চ, ১৮৬৯)

মৃণালিনী

প্রথম খণ্ড



দ্বিতীয় খণ্ড



তৃতীয় খণ্ড



চতুর্থ খণ্ড





প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : আচার্য

একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃট্‌দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্‌। কাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুই জন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গত সাহসে সেই দুর্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধৃবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর! ঘাটের উপরে, সংসারবিরাগী পূণ্যপ্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ করিলেন।

কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন; ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ; শরীর শুষ্ক; আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত; ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি গম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন; দেখিলে তাঁহাকে নির্দয় বা অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা হইত। আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাঁহার সে পুরুষভাব যেন দূর হইল, মুখের গাম্ভীর্যমধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল। আগন্তুক, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছিল; এই জন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দিল্লীর সংবাদ আমি সকল শুনিয়াছি। বখ্‌ইতিয়ার খিলিজিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু পশুহস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে!"

হে। তাহাকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।

ব্রা। তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি বখ্‌তিয়ারকে না মারিয়া সে হাতীকে মারিলে কেন?

হে। আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ-রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "এ সকল ঘটনা ত অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্বে তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরায় গিয়াছিলে?"

হেমচন্দ্র অধোবদন হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বুঝিলাম তুমি মথুরায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মথুরায় গিয়াছিলে, তাহার কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ?"

এবার হেমচন্দ্র রুক্ষভাবে কহিলেন, "সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে আপনারই দয়া। মৃণালিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন?"

মাধবাচার্য কহিলেন, "আমি যে কোথায় পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিলে?"

হে। মাধবাচার্য ভিন্ন এ মন্ত্রণা কাহার? আমি মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, মৃণালিনী আমার আঙ্গটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আর তাহার উদ্দেশ নাই। আমার আঙ্গটি আপনি পাথেয় জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। আঙ্গটির পরিবর্তে অন্য রত্ন দিতে

চাহিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, এ জন্যই বিনা বিবাদে আঙ্গটি দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন।

মাধবাচার্য কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি দেবকার্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবননিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ; যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধজয় কেন হইবে? আবার কি সেই মৃণালিনী-পাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? মাধবাচার্যের জীবন থাকিতে তাহা হইবে না। সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।"

হে। আপনার দেবকার্য আপনি উদ্ধার করুন; আমি এই পর্যন্ত।

মা। তোমার দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। এই কি তোমার দেবভক্তি? ভাল, তাহাই না হউক; দেবতারা আত্মকর্ম সাধন জন্য তোমার ন্যায় মনুষ্যের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রুশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীরগর্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?

হে। রাজ্য-শিক্ষা-গর্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক।

মা। নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল? কেনই বা দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ পাষণ্ডকে সকল বিদ্যা শিখাইলাম?

মাধবাচার্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্নকপোল হইয়া রহিলেন। ক্রমে হেমচন্দ্রের অনিন্দ্য গৌর মুখকান্তি মধ্যাহ্ন-মরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গর্ভাগ্নিগিরি-শিখর-তুল্য, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে মাধবাচার্য কহিলেন, "হেমচন্দ্র, ধৈর্যাবলম্বন কর। মৃণালিনী কোথায়, তাহা বলিব- মৃণালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব। কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্তী হও, আগে আপনার কাজ সাধন কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় না বলিলে, আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না।"

মাধবাচার্য কহিলেন, "আর যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে?"

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি কহিলেন, "তবে সে আপনারই কাজ।"

মাধবাচার্য কহিলেন, "আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকার্যের কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি।"

হেমচন্দ্রের মুখকান্তি বর্ষণোন্মুখ মেঘবৎ হইল। ত্রস্তহস্তে ধনুকে শরসংযোগ করিয়া কহিলেন, "যে মৃণালিনীর বধকর্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।"

মাধবাচার্য হাস্য করিলেন, কহিলেন, "গুরুহত্যায় ব্রাহ্মহত্যায় তোমার যত আমোদ, স্ত্রীহত্যায় আমার তত নহে। এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে না। মৃণালিনী জীবিতা আছে। পার, তাহার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে স্থানান্তরে যাও। আশ্রম কলুষিত করিও না; অপাত্রে আমি কোন ভার দিই না।" এই বলিয়া মাধবাচার্য পূর্ববৎ জপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিলেন। যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নৌকায় ছিল, তাহাকে বলিলেন, "দিগ্বিজয়! নৌকো ছাড়িয়া দাও।"

দিগ্বিজয় বলিল, "কোথায় যাইব?" হেমচন্দ্র বলিলেন, "যেখানে ইচ্ছা- যমালয়।"

দিগ্বিজয় প্রভুর স্বভাব বুঝিত। অস্ফুটস্বরে কহিল, "সেটা অল্প পথ।" এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে কহিলেন, "দূর হউক! ফিরিয়া চল।"

দিগ্বিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনীত হইল। হেমচন্দ্র লম্ফে তীরে অবতরণ করিয়া পুনর্বার মাধবাচার্যের আশ্রমে গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া মাধবাচার্য কহিলেন, "পুনর্বার কেন আসিয়াছ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই স্বীকার করিব। মৃণালিনী কোথায় আছে আজ্ঞা করুন।"

মা। তুমি সত্যবাদী-আমার আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গৌড়নগরে এক শিষ্যের বাটীতে মৃণালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যতদিন মৃণালিনী তাঁহার গৃহে থাকিবে, ততদিন সে পুরুষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।

হে। সাক্ষাৎ না পাই, যাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে কি কার্য করিতে হইবে অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ?

হে। যবনেরা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি ত্বরায় বখ্‌সতিয়ার খিলিজি সেনা লইয়া, গৌড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্যের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "এতদিনে বিধাতা বুঝি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন।"

হেমচন্দ্র একতানমনে মাধবাচার্যের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্য বলিতে লাগিলেন, "কয় মাস পর্যন্ত আমি কেবল নিযুক্ত আছি, গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।"

হে। কি প্রকার?

মা। গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।

হে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে? আর কাহা কর্তৃক?

মা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবেক।

হে। তবে আমার জয়লাভের কোথা সম্ভাবনা? আমি ত বণিক নহি।

মা। তুমিই বণিক। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে?

হে। আমি তখন বণিক বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে।

মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি করিব?"

মা। গৌড়েশ্বরের সেনা আছে।

হে। থাকিতে পারে-সে বিষয়েও কতক সন্দেহ; কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন?

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানেই গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে। গৌড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, মাধবাচার্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যাও, বৎস! প্রতি পদে বিজয় লাভ কর। যদি ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মৃণালিনী! মৃণালিনী পাখী আমি তোমারই জন্যে পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এইজন্য তোমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছু দিনের জন্য মন:পীড়া দিতেছে।"

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি করিব?"

মা। গৌড়েশ্বরের সেনা আছে।

হে। থাকিতে পারে-সে বিষয়েও কতক সন্দেহ; কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন?

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানেই গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে। গৌড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, মাধবাচার্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যাও, বৎস! প্রতি পদে বিজয় লাভ কর। যদি ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মৃণালিনী! মৃণালিনী পাখী আমি তোমারই জন্যে পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এইজন্য তোমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছু দিনের জন্য মন:পীড়া দিতেছে।"

ম। কিন্তু এ পর্যন্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই। রাগ করিও না সখি! তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি; এই জন্য বলিতেছি।

মৃণালিনী অধোবদনে রহিলেন। ক্ষণেক পরে চক্ষুর জল মুছিলেন। কহিলেন, "মণিমালিনী! এ বিদেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই। আমাকে ভাল কথা বলে, এমন কেহ নাই। যাহারা আমাকে ভালবাসিত, তাহাদিগের সহিত যে, আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে, সে ভরসাও করি না। কেবলমাত্র তুমি আমার সখী- তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে?"

ম। আমি তোমাকে ভালবাসিব, বাসিয়াও থাকি, কিন্তু যখন ঐ কথাটি মনে পড়ে, তখন মনে করি-

মৃণালিনী পুনশ্চ নীরবে রোদন করিলেন। কহিলেন, "সখি, তোমার মুখে এ কথা আমার সহ্য হয় না। যদি তুমি আমার নিকটে শপথ কর যে, যাহা বলিব, তাহা এ সংসারে কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবে না, তবে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি। তাহা হইলে তুমি আমাকে ভালবাসিবে।"

ম। আমি শপথ করিতেছি।

মৃ। তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে। তাহা ছুঁয়ে শপথ কর।

মণিমালিনী তাই করিলেন।

তখন মৃণালিনী মণিমালিনীর কানে যাহা কহিলেন, তাহার এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। শ্রবণে মণিমালিনীর পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন কথা সমাপ্ত হইল।

মণিমালিনী কহিলেন, "তাহার পর, মাধবাচার্যের সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে? সে বৃত্তান্ত বলিতেছিলে বল।"

মৃণালিনী কহিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের আঙ্গটি দেখিয়া তাঁকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দূতী কহিল যে, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি নাই। বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বিবেচনাশূন্য হইলাম। তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার বাহিরে এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মনে করিলাম যে, রাজপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আসিলাম। নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই বুঝিলাম যে, এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহে।"

ম। আর অমনি তুমি চীৎকার করিলে?

মৃ। চীৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চীৎকার আসিল না।

ম। আমি হইলে জলে ঝাঁপ দিতাম।
মৃ। হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মরিব?

ম। তার পর কি হইল?

মৃ। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে "মা" বলিয়া বলিল, "আমি তোমাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেছি-আমি তোমার পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না। আমার নাম মাধবাচার্য, আমি হেমচন্দ্রের গুরু। কেবল হেমচন্দ্রের গুরু এমত নহি; ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকার্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার প্রধান সহায়; তুমি তাহার প্রধান বিঘ্ন।"

আমি বলিলাম, "আমি বিঘ্ন?" মাধবাচার্য কহিলেন, "তুমিই বিঘ্ন। যবনদিগের জয় করা, হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার করা, সুসাধ্য কর্ম নহে; হেমচন্দ্র ব্যতীত কাহারও সাধ্য নহে; হেমচন্দ্রও অনন্যমনা না হইলে তাঁর দ্বারাও এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। যতদিন তোমার সাক্ষাৎলাভ সুলভ থাকিবে, ততদিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য ব্রত নাই-সুতরাং যবন মারে কে?" আমি কহিলাম, "বুঝিলাম, প্রথমে আমাকে না মারিলে যবন মারা হইবে না। আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আঙ্গটি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে মারিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

ম। এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে?

মৃ। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায় আমার হাড় জ্বলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা কি? মাধবাচার্য আমাকে মুখরা মনে করিলেন, মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "আমি যে তোমাকে এইরূপে হস্তগত করিব, তাহা হেমচন্দ্র জানেন না|"

আমি মনে মনে কহিলাম, তবে যাঁহার জন্য এ জীবন রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে জীবন ত্যাগ করিব না। মাধবাচার্য বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না-কেবল আপাতত: হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল। যাহাতে তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া তোমাকে রাজমহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমার কর্তব্য নহে?" আমি কহিলাম, "আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয়, তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না|" মাধবাচার্য বলিলেন, "বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বুড়া উভয়ের বিবেচনাশক্তি তুল্য; কিন্তু তাহা নহে। হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমাদিগের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না। আর তুমি সম্মত হও বা না হও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব। গৌড় দেশে অতি শান্তস্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাখিয়া আসিব। তিনি তোমাকে আনিয়া আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। তিনি তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম|" এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি। ও কি ও সই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভিখারিণী

সখীদ্বয় এই সকল কথাবার্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোমলকণ্ঠনি:সৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

"মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি,

   শ্যামবিলাসিনি-রে!"

মৃণালিনী কহিলেন, "সই, কোথায় গান করিতেছে?"

মণিমালিনী কহিলেন, "বাহির বাড়ীতে গায়িতেছে!"

গায়ক গায়িতে লাগিল।

"কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,

   কাহে বিবাসিনী-রে|"

মৃ। সখি! কে গায়িতেছে জান?

ম। কোন ভিখারিণী হইবে।

আবার গীত-

“বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,

কাঁহে তু তেয়াগী-রে;

দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর,

ফিরে তুয়া লাগি-রে।”

মৃণালিনী বেগের সহিত কহিলেন, “সই! সই! উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।”

মণিমালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন। ততক্ষণ সে গায়িতে লাগিল-

“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,

বহুত পিয়াসা-রে।

চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী,

না মিটল আশা-রে।

সা নিশা-সমরি___”

এমন সময়ে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বাটীর ভিতর আনিলেন।

সে অন্ত:পুরে আসিয়া পূর্ববৎ গায়িতে লাগিল-

“সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি,

কাহা মিলে দেখা-রে।

শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী,

বনে বনে একা-রে।”

মৃণালিনী তাহাকে কহিলেন, “তোমার দিব্য গলা, তুমি গীতটি আবার গাও।”

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর আসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমন নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ

আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড়, চঞ্চল, হাস্যময়; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার- ধূলিকর্দমপরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে। প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়, গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ। সে আজ্ঞামত পূর্ববৎ গায়িতে লাগিল-

“মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি-রে।

কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী-রে ||

বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাঁহে তু তেয়াগী-রে |

দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি-রে ||

বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা-রে |

চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা-রে ||

সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা-রে |

শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা-রে ||”

গীত সমাপ্ত হইলে মৃণালিনী কহিলেন, “তুমি সুন্দর গাও। সই মণিমালিনী, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয়। একে কিছু দাও না?”

মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে মৃণালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুন ভিখারিণি! তোমার নাম কি?”

ভি। আমার নাম গিরিজায়া।

মৃ। তোমার বাড়ী কোথায়?

গি। এই নগরেই থাকি।

মৃ। তুমি কি গীত গাইয়া দিনপাত কর?

গি। আর কিছুই ত জানি না।

মৃ। তুমি গীত সকল কোথায় পাও?

গি। যেখানে যা পাই তাই শিখি।

মৃ। এ গীতটি কোথায় শিখিলে?

গি। একটি বেণে আমাকে শিখাইয়াছে।

মৃ। সে বেণে কোথায় থাকে?

গি। এই নগরেই আছে।

মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল- প্রাত:সূর্যকরস্পর্শে যেন পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "বেণেতে বাণিজ্য করে- সে বণিক কিসের বাণিজ্য করে?"

গি। সবার যে ব্যবসা, তারও সেই ব্যবসা।

মৃ। সে কিসের ব্যবসা?

গি। কথার ব্যবসা।

মৃ। এ নূতন ব্যবসা বটে। তাহাতে লাভালাভ কিরূপ?

গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অলাভ কোন্দল।

মৃ। তুমিও ব্যবসায়ী বটে। ইহার মহাজন কে?

গি। যে মহাজন।

মৃ। তুমি ইহার কি?

গি। নগ্দাই মুটে।

মৃ। ভাল তোমার বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে দেখি।

গি। এ সামগ্রী দেখে না; শুনে।

মৃ। ভাল-শুনি।

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল-

"যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।

ঝাঁপ দিয়া পশি জলে,　　যতনে তুলিয়া গলে,

　　পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে।

নিদ্রার আবেশে মোর　　গৃহেতে পলিশ চোর,

　　কন্ঠের কাটিল ডোর মণি হরে নিল |”

মৃণালিনী, বাষ্পপীড়িতলোচনে, গদ্গদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, “এ কোন্ চোরের কথা?”

গি। বেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার।

মৃ। তাঁহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের প্রাণ বাঁচে না।

গি। বুঝি ব্যাপারিরও নয়।

মৃ। কেন, ব্যাপারির কি?

গিরিজায়া গায়িল-

“ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ |

কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ ||

হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি |

সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি ||”

মৃণালিনী সস্নেহে কোমল স্বরে কহিলেন, “মৃণাল কোথায়? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে রাখিতে পারিবে?”

গি। পারিব- কোথায় বল।

মৃণালিনী বলিলেন,

“কন্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে |

জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ||

রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন |

চরণ বেড়িয়া তারে, করিল বন্ধন ||

বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন |

হৃদয়কমলে মোর, তোমার আসন ||

আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে |

কাঁপিল কন্টক সহ মৃণালিনী জলে ||

হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে |

উড়িল মরালরাজ, মানস বিলাসে ||

ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে |

ডুবিল অতল জলে, মৃণালিনী মরে ||

কেমন গিরিজায়া, গীত শিখিতে পারিবে?

গি। তা পারিব। চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব?

মৃ। না। এ ব্যবসায়ে আমার লাভের মধ্যে ঐটুকু।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহার স্নেহশালিনী সখী- সকলই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী পিতৃপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। অতএব তিনি এ সকল কথা সখীর নিকট গোপনে যত্নবতী হইয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, "আজি আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার বোঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবার কোন সামগ্রী থাকে, তবে আমি কিনিব |"

গিরিজায়া বিদায় হইল। মৃণালিনী যে তাহাকে পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গিরিজায়া কতিপয় পদ গমন করিলে মণিমালিনী কিছু চাউল, একছড়া কলা, একখানি পুরাতন বস্ত্র, আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আর মৃণালিনীও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার সময়ে উহার কানে কানে কহিলেন, "আমার ধৈর্য হইতেছে না, কালি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তরদিকে প্রাচীনমূলে অবস্থিতি করিও; তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক যদি আসেন সঙ্গে আনিও |"

গিরিজায়া কহিল, "বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব |"

মৃণালিনী মণিমালিনীর নিকট প্রত্যাগত্যা হইলে মণিমালিনী কহিলেন, "সই, ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?"

মৃণালিনী কহিলেন,

"কি বলিব সই-

সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই-

কাণে কাণে কি কথাটি বলে দিলি ওই ||

সই ফিরে ক'না সই, সই ফিরে ক'না সই |

সই কথা কোস কথা কব, নইলে কারো নই |"

মণিমালিনী হাসিয়া কহিলেন, "হলি কি লো সই?"

মৃণালিনী কহিলেন, "তোমারই সই |"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দূতী

লক্ষ্মণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল; অপরাহ্নে তাহার তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুসুমিত অশোকশাখা নিষ্প্রয়োজনে হেমচন্দ্র ছুরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন, এবং মুহুর্মুহু: পথপ্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে আসিল না। ভৃত্য দিগ্বিজয় আসিল, হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে কহিলেন, "দিগ্বিজয়, ভিখারিণী আজি এখনও আসিল না। আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও |"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল। নগরীর রাজপথে গিরিজায়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

গিরিজায়া বলিল, "কেও দিব্বিজয়?" দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, "আমার নাম দিগ্বিজয় |"

গি। ভাল দিগ্বিজয়- আজি কোন্ দিক জয় করিতে চলিয়াছ?

দি। তোমার দিক।

গি। আমি কি একটা দিক? তোমার দিগ্বিদিগ্জ্ঞা ন নাই।

দি। কেমন করিয়া থাকিবে- তুমি যে অন্ধকার। এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না।

দি। না। সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।

গি। পরের জন্যেই মলেম। তবে চল।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের সঙ্গে চলিলেন। দিগ্বিজয় অশোকতলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অন্যত্র গমন করিল। হেমচন্দ্র অন্যমনে মৃদু মৃদু গাইতেছিলেন,

"বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে___"

গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে গায়িল-

"চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা রে।"

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "কে গিরিজায়া! আশা কি মিটল?"

গি। কার আশা? আপনার না আমার?

হে। আমার আশা। তাহা হইলেই তোমার মিটিবে।

গি। আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে? লোকে বলে রাজা রাজ্ড়া র আশা কিছুতেই মিটে না।

হে। আমার অতি সামান্য আশা।

গি। যদি কখন মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা তাঁহার নিকট বলিব।

হেমচন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন, "তবে কি আজিও মৃণালিনীর সন্ধান পাও নাই? আজি কোন্ পাড়ায় গীত গাইতে গিয়াছিলে?"

গি। অনেক পাড়ায়-সে পরিচয় আপনার নিকট নিত্য নিত্য কি দিব? অন্য কথা বলুন।

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বুঝিলাম বিধাতা বিমুখ। ভাল পুনর্বার কালি সন্ধানে যাইবে।"

গিরিজায়া তখন প্রণাম করিয়া কপট বিদায়ের উদ্যোগ করিল। গমনকালে হেমচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে। আজি কি তোমার গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিয়াছে?"

গি। কে কি বলিবে? এক মাগী তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল- বলে মথুরাবাসিনীর জন্যে শ্যামসুন্দরের ত মাথাব্যথা পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে, যেন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন "এত যত্নেও যদি সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা- কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া আত্মকর্ম নষ্ট করি; গিরিজায়ে, কালি তোমাদিগের নগর হইতে বিদায় হইব।"

"তথাস্তু" বলিয়া গিরিজায়া মৃদু মৃদু গান করিতে লাগিল,-

"শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা রে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "ও গান এই পর্যন্ত। অন্য গীত গাও।"

গিরিজায়া গায়িল,

“যে ফুল ফুটিত সখি, গৃহতরুশাখে,

কেন রে পবনা, উড়ালি তাকে।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জন্য দু:খ কি? ভাল গীত গাও।”

গিরিজায়া গায়িল,

“কন্টকে গঠিল, বিধি, মৃণাল অধমে।

জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥”

হে। কি, কি? মৃণাল কি?

গি।

কন্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।

জলে তারে ডুবাইল, পীড়িয়া মরমে॥

রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।

চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥

না- অন্য গান গাই।

হে। না- না -না- এই গান- এই গান গাও। তুমি রাক্ষসী।

গি।

বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।

হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন॥

আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।

কাঁপিল কন্টকসহ মৃণালিনী জলে॥

হে। গিরিজায়া! গিরি- এ গীত তোমাকে কে শিখাইল?

গি। (সহাস্যে)

হেন কালে কালমেঘ উঠিল আকাশে।

উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে।

ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।

ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে ||

হেমচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদস্বরে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ আমারই মৃণালিনী। তুমি তাহাকে কোথায় দেখিলে?

গি।

দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবনভরে,

মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

হে। এখন রূপক রাখ, আমার কথার উত্তর দাও- কোথায় মৃণালিনী?

গি। এই নগরে।

হেমচন্দ্র রুষ্টভাবে কহিলেন, "তা ত আমি অনেক দিন জানি। এ নগরে কোন্ স্থানে?"

গি। হৃষীকেশ শর্মার বাড়ী।

হে। কি পাপ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। এতদিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ?

গি। সন্ধান করিয়াছি।

হেমচন্দ্র দুই বিন্দু- দুই বিন্দু মাত্র অশ্রুমোচন করিলেন। পুনরপি কহিলেন, "সে এখান হইতে কত দূর?

গি। অনেক দূর।

হে। এখান হইতে কোন্ দিকে যাইতে হয়?

গি। এখান হইতে দক্ষিণ, তার পর পূর্ব, তার পর উত্তর, তার পর পশ্চিম-

হেমচন্দ্র হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। কহিলেন, "এ সময়ে তামাসা রাখ-নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব |"

গি। শান্ত হউন। পথ বলিয়া দিলে কি আপনি চিনিতে পারিবেন? যদি তা না পারিবেন, তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার সর্বকামনা সিদ্ধ হউক-মৃণালিনী কি বলিল?"

গি। তা ত বলিয়াছি-

"ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে।"

হে। মৃণালিনী কেমন আছে?

গি। দেখিলাম শরীরে কোন পীড়া নাই।

হে। সুখে আছে কি ক্লেশে আছে- কি বুঝিলে?

গি। শরীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়- হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের কন্যা সই।

হে। তুমি অধ:পাতে যাও; মনের কথা কিছু বুঝিলে?

গি। বর্ষাকালের পদ্মের মত; মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে।

হে। পরগৃহে কি ভাবে আছে?

গি। এই অশোক ফুলের স্তবকের মত। আপনার গৌরবে আপনি নম্র।

হে। গিরিজায়া! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র। তোমার ন্যায় বালিকা আর দেখি নাই।

গি। মাথা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্রও এমন আর দেখেন নাই।

হে। সে অপরাধ লইও না, মৃণালিনী আর কি বলিল?

গি। যো দিন জানকী-

হে। আবার?

গি। যো দিন জানকী, রঘুবীর নিরখি-

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করিলেন। তখন সে কহিল, "ছাড়! ছাড়! বলি! বলি!"

"বল" বলিয়া হেমচন্দ্র কেশ ত্যাগ করিলেন।

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল, "মহাশয়, আপনি যদি মৃণালিনীকে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন।"

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নি:শব্দে অশোকতলে পাদচরণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন, "মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মৃণালিনী কি বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া যাইও।"

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তিতান্ত:করণে অশোকবৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ভুজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া, শয়ান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে, সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন করস্পর্শ হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য।

মাধবাচার্য কহিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান কর। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি- সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় কেন চাহিয়া রহিয়াছ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন?"

মাধবাচার্য এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি এ পর্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ- ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করা হইবে না। বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। আমি আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে -নৌকা প্রস্তুত আছে। অস্ত্রশস্ত্রাদি গৃহমধ্য হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।"

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হানি নাই-আমি আশা ভরসা বিসর্জন করিয়াছি। চলুন। কিন্তু আপনি- কামচর না অন্তর্যামী?"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুন:প্রবেশ পূর্বক বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এবং আপনার সম্পত্তি এক জন বাহকের স্কন্ধে দিয়া আচার্যের অনুবর্তী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : লুব্ধ

মৃণালিনী বা গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্শ্বে সংমিলিত হইলেন। মৃণালিনী গিরিজাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "কই, হেমচন্দ্র কোথায়?"

গিরিজায়া কহিল, "তিনি আইসেন নাই।"

"আইসেন নাই!" এই কথাটি মৃণালিনীর অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল। ক্ষণেক উভয়ে নীরব। তৎপরে মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আসিলেন না?"

গি। তাহা আমি জানি না। এই পত্র দিয়াছেন।

এই বলিয়া গিরিজায়া তাঁহার হস্তে পত্র দিল। মৃণালিনী কহিলেন, "কি প্রকারেই বা পড়ি। গৃহে গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িলে মণিমালিনী উঠিবে।"

গিরিজায়া কহিল, "অধীরা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল, চক্ মকি, সোলা সকলই আনিয়া রাখিয়াছি। এখনই আলো করিতেছি।"

গিরিজায়া শীঘ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জ্বালিত করিল। অগ্নুৎপাদনশব্দ একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল। দীপালোক সে দেখিতে পাইল।

গিরিজায়া দীপ জ্বালিত করিলে মৃণালিনী নিম্নলিখিত মত মনে মনে পাঠ করিলেন।

"মৃণালিনী! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব? তুমি আমার জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবানুগ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্রণয়ী মনে করিবে- অথবা অন্যা হইলে মনে করিত- তুমি করিবে না। আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি- যদি তৎপ্রতি অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। তৎসাধন জন্য আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি যে তোমার জন্য সত্যভঙ্গ করিব, তোমারও এমন সাধ নহে। অতএব এক বৎসর কোন ক্রমে দিন যাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুরবধূ করিয়া আত্মসুখ সম্পূর্ণ করিব। এই অল্পবয়স্কা প্রগল্ভনবুদ্ধি বালিকাহস্তে উত্তর প্রেরণ করিও।"

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া! আমার পাতা লেখনী কিছুই নাই যে উত্তর লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও। তুমি বিশ্বাসী, পুরস্কার স্বরূপ আমার অঙ্গের অলঙ্কার দিতেছি।"

গিরিজা কহিল, "উত্তর কাহার নিকট লইয়া যাইব? তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, 'আজ রাত্রেই আমাকে প্রত্যুত্তর আনিয়া দিও।' আমিও স্বীকার করিয়াছিলাম। আসিবার সময় মনে করিলাম, হয়ত তোমার নিকট লিখিবার সামগ্রী কিছুই নাই; এজন্য সে সকল যোটপাট করিয়া আনিবার জন্য তাহার উদ্দেশে গেলাম। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। শুনিলাম তিনি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন।"

মৃ। নবদ্বীপ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। সন্ধ্যাকালেই?

গি। সন্ধ্যাকালেই। শুনিলাম তাঁহার গুরু আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য। মাধবাচার্যই আমার কাল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া তুমি বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।"

গিরিজায়া কহিল, "আমি চলিলাম।" এই বলিয়া গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃদু মৃদু গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে মৃণালিনী গৃহমধ্যে পুন:প্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। মৃণালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল, "তবে সাধ্বি! এইবার জালে পড়িয়াছ। অনুগৃহীত ব্যক্তিটা কে শুনিতে পাই না?"

মৃণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন, "ব্যোমকেশ! ব্রাহ্মকুলে পাষণ্ড! হাত ছাড়।"

ব্যোমকেশ হৃষীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোর মূর্খ এবং দুশ্চরিত্র। সে মৃণালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং স্বাভিলাষ পূরণের অন্য কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলপ্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতেন না, এ জন্য ব্যোমকেশ এ পর্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃণালিনীর ভর্ৎসনায় ব্যোমকেশ কহিল, "কেন হাত ছাড়িব? হাতছাড়া কি করতে আছে? ছাড়াছাড়িতে কাজ কি ভাই? একটা মনের দু:খ বলি, আমি কি মনুষ্য নই? যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না?"

মৃ। কুলাঙ্গার! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকিয়া গৃহস্থ সকলকে উঠাইব।

ব্যো। উঠাও। আমি কহিব অভিসারিকাকে ধরিয়াছি।

মৃ। তবে অধ:পাতে যাও। এই বলিয়া মৃণালিনী সবলে হস্তমোচন জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, "অধীর হইও না। আমার মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিব। এখন তোমার সেই ভগিনী মণিমালিনী কোথায়?"

মৃ। আমি তোমার ভগিনী।

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর ভগিনী- আমার ব্রাহ্মণীর ভেয়ের ভগিনী- আমার প্রাণাধিকা

রাধিকা! সর্বার্থসাধিকা!

এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যখন মাধবাচার্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, তখন মৃণালিনী স্ত্রীস্বভাবসুলভ চীৎকারে রতি দেখান নাই, এখনও শব্দ করিলেন না।

কিন্তু মৃণালিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। ব্যোমকেশ লাথি খাইয়া বলিল, "ভাল ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী- আমি তোমার জয়দ্রথ।"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "আর আমি তোমার অর্জুন।"

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "রাক্ষসি! তোর দন্তে কি বিষ আছে?" এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিল যে পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিত রুধির পড়িতেছে।

মৃণালিনী মুক্তাহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও প্রথমে ব্যোমকেশের ন্যায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কেন না তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভল্লুকোচিত কার্য তাঁহার করণীয় নহে। কিন্তু তখনই নক্ষত্রালোকে খর্বাকৃতা বালিকামূর্তি সম্মুখ হইতে

অপসৃতা হইতেছে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহার বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে, "পলাইয়া আইস" বলিয়া স্বয়ং পলায়ন করিল।

পলায়ন মৃণালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে। তিনি পলায়ন করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্তনাদ করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি গজেন্দ্রমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল। সম্মুখে হৃষীকেশ পুত্রকে শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? কেন ষাঁড়ের মত চীৎকার করিতেছ?"

ব্যোমকেশ কহিল, "মৃণালিনী অভিসারে গমন করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পৃষ্ঠে দংশন করিয়াছে।"

হৃষীকেশ পুত্রের কুরীতি কিছুই জানিতেন না। মৃণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল। তৎকালে তিনি মৃণালিনীকে কিছুই বলিলেন না। নি:শব্দে গজগামিনীর পশ্চাৎ তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হৃষীকেশ

মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া হৃষীকেশ কহিলেন, "মৃণালিনী! তোমার এ কি চরিত্র?"

মৃ। আমার কি চরিত্র?

হৃ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, গুরুর অনুরোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। তুমি আমার মেয়ে মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শোও- তোমার কুলটাবৃত্তি কেন?

মৃ। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী।

হৃষীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন, "কি পাপীয়সি! আমার অন্নে উদর পূরাবি, আর আমাকে দুর্বাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ। না হয় মাধবাচার্য রাগ করিবেন, তা বলিয়া এমন কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না।"

মৃ। যে আজ্ঞা- কালি প্রাতে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

হৃষীকেশের বোধ ছিল যে, যে কালে তাঁহার গৃহবহিষ্কৃত হইলেই মৃণালিনী আশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন উত্তর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু মৃণালিনী নিরাশ্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতা নহেন দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি জারগৃহে স্থান পাইবার ভরসাতেই এরূপ উত্তর করিলেন। ইহাতে হৃষীকেশের কোপ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন, "কালি প্রাতে! আজই দূর হও।"

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীর নিকট বিদায় হইয়া আজিই দূর হইতেছি। এই বলিয়া মৃণালিনী গাত্রোত্থান করিলেন।

হৃষীকেশ কহিলেন, "মণিমালিনীর সহিত কুলটার আলাপ কি?"

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল। কহিলেন, "তাহাই হইবে। আমি কিছুই লইয়া আসিয়া নাই; কিছুই লইয়া যাইব না। একবসনে চলিলাম। আপনাকে প্রণাম হই।"

এই বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মৃণালিনী শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া চলিলেন।

যেমন অন্যান্য গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের আর্তনাদে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তদ্রূপ উঠিয়াছিলেন। মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা শয্যাগৃহ পর্যন্ত আসিলেন দেখিয়া তিনি এই অবসরে ভ্রাতার সহিত কথোকথন করিতেছিলেন; এবং ভ্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। যখন তিনি ভর্ৎসনা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন প্রাঙ্গণভূমে, দ্রুতপাদবিক্ষেপিণী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই, অমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "সখি, মণিমালিনী, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না-তোমার বাপ মানা করেছেন|"

ম। সে কি মৃণালিনী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সর্বনাশ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন! সখি, ফের। রাগ করিও না।

মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। পর্বতসানুবাহী শিলাখণ্ডের ন্যায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন। তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃসন্নিধানে আসিলেন। মৃণালিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্বসঙ্কেত স্থানে গিরিজায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ?"

গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিলাম। তুমি আইস না আইস-দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।

মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে?

গি। তা ক্ষতি কি? বামুন বৈ ত গরু নয়?

মৃ। কিন্তু তুমি যে গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম?

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। দেখে মনে হলো, মিন্‌সে আমাকে একদিন "কালা পিঁপ্‌ড়ে" বলে ঠাট্টা করেছিল। সে দিন হুল ফুটানটা বাকি ছিল। সুযোগ পেয়ে বামুনের, ঋণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা যাইবে?

মৃ। তোমার ঘরদ্বার আছে?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। সেখানে আর কে থাকে?

গি। এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ি বলি।

মৃ। চল তোমার ঘরে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরিজায়া কহিল, “কিন্তু সে ত কুঁড়ে। সেখানে কয় দিন থাকিবে?”

মৃ। কালি প্রাতে অন্যত্র যাইব।

গি। কোথা? মথুরায়?

মৃ। মথুরায় আমার আর স্থান নাই।

গি। তবে কোথায়?

মৃ। যমালয়।

এই কথার পর দুইজনে ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর মৃণালিনী বলিল, “এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?”

গি। বিশ্বাস হইবে না কেন? কিন্তু সে স্থান ত আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে। এখন কেন আর এক স্থানে যাও না?

মৃ। কোথা?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ভিখারিণী বেশে কোন মায়াবিনী। তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না। বিশেষ তুমি হিতৈষী। নবদ্বীপেই যাইব স্থির করিয়াছি।

গি। একা যাইবে?

মৃ। সঙ্গী কোথায় পাইব?

গি। (গায়িতে গায়িতে)

“মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।

সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে ||

মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,

যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে ||”

মৃ। এ কি রহস্য, গিরিজায়া?

গি। আমি যাব।

মৃ। সত্য সত্যই?

গি। সত্য সত্যই যাব।

মৃ। কেন যাবে?

গি। আমার সর্বত্র সমান। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর।

## দ্বিতীয় খণ্ড
### প্রথম পরিচ্ছেদ : গৌড়েশ্বর

অতি বিস্তীর্ণ সভমণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বেদির উপরে রত্নপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান রাজা বসিয়া আছেন। শিরোপরি কনককিঙ্কিণী সংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষবিভূষিত, অনিন্দ্যমূর্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে, এক দিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্য দিকে মহামাত্য ধর্মাধিকারকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকগণ ক্যত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিক্যা, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাধারণতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্যসকল সমাপ্ত হইলে, সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচার্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জনা করিবেন। আপনি রাজনীতিবিশারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলে যত রাজগণ আছেন সর্বাপেক্ষা বহুদর্শী; প্রজাপালক; আপনিই আজন্ম রাজা। আপনার অবিদিত নাই যে, শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম। আপনি প্রবল শত্রুদমনের কি উপায় করিয়াছেন?”

রাজা কহিলেন, “কি আজ্ঞা করিতেছেন?” সকল কথা বর্ষীয়মান রাজার শ্রুতিসুলভ হয় নাই।

মাধবাচার্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্মাধিকার পশুপতি কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ! মাধবাচার্য রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রুদমনের কি উপায় হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্যন্ত দমিত হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি সবিশেষ বাচন করুন।”
মাধবাচার্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বরে কহিলেন, “মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্যাবর্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।”

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। তিনি কহিলেন, “তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?”

মাধবাচার্য কহিলেন, “ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন; এখনও তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্তু আসিলে আপনি কি প্রকারে তাহাদিগের নিবারণ করিবেন?”

রাজা কহিলেন- “আমি কি করিব-আমি কি করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক।”

এবম্ভূত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা বলিলেন, "আচার্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবশ্য ঘটিবে -কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি?"

মাধবাচার্য কহিলেন, "ভাল সভাপণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন?"

দামোদর কহিলেন, "বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা___"

মা। 'যথা' থাকুক-বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন; দেখান এরূপ উক্তি কোথায় আছে?

দা। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম? ভাল, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কি না?

মা। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানবধর্মশাস্ত্রেরও কি পারদর্শী নহেন?

দা। কি জ্বালা! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হয়েন, আমি কোন্ ছার? আপনার সম্মুখে গ্রন্থের নাম স্মরণ হইবে না; কিন্তু কবিতাটা শ্রবণ করুন।

মা। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্টুপ্ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি- তুরকজাতীয় কর্তৃক গৌড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।

পশুপতি কহিলেন, "আপনি কি সর্বশাস্ত্রবিৎ?"

মাধবাচার্য কহিলেন, "আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন?"

সভাপণ্ডিতের এক জন পারিষদ কহিলেন, "আমি করিব। আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে আত্মশ্লাঘাপরবশ, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

মাধবাচার্য কহিলেন, "মূর্খ তিনজন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষাক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ।"

সভাপণ্ডিতের পারিষদ অধোবদনে উপবেশন করিলেন।

পশুপতি কহিলেন, "যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য কহিলেন, "সাধু! সাধু! আপনার যেরূপ যশ:, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন! আমার কেবল এই জিজ্ঞাসা যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে!"

পশুপতি কহিলেন, "মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য। এ সভাতলে প্রকাশ্য নহে। কিন্তু যে অশ্ব, পদাতি এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।"

মা। কতক কতক জানিয়াছি।

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন?

মা। প্রস্তাবের তাৎপর্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য। আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে।

মা। যবনবিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন। এই মাত্র কারণ।

প। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন?

মা। আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ডবিধান করিবেন। গৌড়রাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া উভয়ে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল।

প। রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইবে। তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে।

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুসুমনির্মিতা

উপনগর প্রান্তে গঙ্গাতীরবর্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থে রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের পরামর্শনুসারে সুরম্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বয়োবাহুল্যপ্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্বতোভাবে অসমর্থ। অথচ নি:সহায়। তাঁহার সহধর্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছু দিন হইল, ইঁহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি ইঁহারা আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া বাসান্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া দু:খিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।" ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ কার্য ভৃত্য দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না।"

ব্রাহ্মণ বস্তুত: অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না-কেন না, তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমানপ্রযুক্ত ভৃত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এজন্য স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

জনার্দন আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

হে। আমি আপনার ভৃত্য।

জ। কি বলিলে-তোমার নাম রামকৃষ্ণ?

হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।"

জ। ভাল ভাল; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম হনুমান দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "নামের কথা দূর হউক। কার্যসাধন হইলেই হইল।" বলিলেন, "নবদ্বীপাধিপতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিলাম আমার আসায় আপনি স্থান ত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না, এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।
হে। (অত্যুচ্চৈ:স্বরে) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না? তোমার বাটীতে কি? আদ্য শ্রাদ্ধ?

হে। ভাল: আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেরূপ এ বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্মাণকৌশলসীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, "তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?"

বালিকা বলিল, "আমি মনোরমা।"

হে। ইনি তোমার পিতামহ?

ম। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?

হে। শুনিলাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

ম। কেন?

এ 'কেন'র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অন্য উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?"

ম। তুমি কি আমার ভাই?

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী?" কহিলেন, "কেন তিরস্কার করিব?"

ম। যদি আমি দোষ করি?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?

মনোরমা ক্ষুণ্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?"

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করি না-তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?

হেমচন্দ্র হাসিলেন-কহিলেন, "আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,-তাহার উপায় কি?"

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন।

হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। এবং কহিলেন, "মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন-আশীর্বাদ করুন |" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং "ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্য ব্যাপৃতা ছিলেন-ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ কাণে কম শোনেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নৌকাযানে

হেমচন্দ্র ত উপবনগৃহে সংস্থাপিত হইলেন। আর মৃণালিনী? নির্বাসিতা, পরপীড়িতা, সহায়হীনা মৃণালিনী কোথায়?

সান্ধ্য গগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহু লোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল। নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিঙ্গি অন্য নৌকা হইতে পৃথক এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকেরা আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র তরণীতে দুইটিমাত্র আরোহী। দুইটিই স্ত্রীলোক। পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃণালিনী আর গিরিজায়া।

গিরিজায়া মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আজিকার দিন কাটিল।"

মৃণালিনী কোন উত্তর করিল না।

গিরিজায়া পুনরপি কহিল, "কালিকার দিনও কাটিবে-পরদিনও কাটিবে-কেন কাটিবে না?"

মৃণালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না; কেবলমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণি! এ কি এ? দিবানিশি চিন্তা করিয়া কি হইবে? যদি আমাদিগের নদীয়া আসা কাজ ভাল না হইয়া থাকে, চল, এখনও ফিরিয়া যাই।"

মৃণালিনী এবার উত্তর করিলেন। বলিলেন, "কোথায় যাইবে?"

গি। চল, হৃষীকেশের বাড়ী যাই।

মৃ। বরং এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিব।

গি। চল, তবে মথুরায় যাই।

মৃ। আমি ত বলিয়াছি, তথায় আমার স্থান নাই। কুলটার ন্যায় রাত্রিকালে যে বাপের ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব?

গি। কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ ভাবিয়াও আইস নাই। যাইতে ক্ষতি কি?

মৃ। সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যে বাপের ঘরে আদরের প্রতিমা ছিলাম, সে বাপের ঘরে ঘৃণিত হইয়াই বা কি প্রকারে থাকিব?

গিরিজায়া অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, মৃণালিনীর চক্ষু হইতে বারিবিন্দুর পর বারিবিন্দু পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া কহিল, "তবে কোথায় যাইবে?"

মৃ। যেখানে যাইতেছি।

গি। সে ত সুখের যাত্রা। তবে অন্যমন কেন? যাহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, ইহার অপেক্ষা সুখ আর কি আছে?

মৃ। নদীয়ায় আমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না।

গি। কেন? তিনি কি সেখানে নাই?

মৃ। সেইখানেই আছেন। কিন্তু তুমি ত জান যে, আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত। আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব?

গিরিজায়া নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী আবার কহিলেন, "আর কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব। আমি কি বলিব যে, হৃষীকেশের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি, না, বলিব যে, হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে?"

গিরিজায়া ক্ষণেক নীবর থাকিয়া কহিল, "তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না?"

মৃ। না।

গি। তবে যাইতেছ কেন?

মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।

গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না। বলিল, "তবে আমি গীত গাই,

চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।

দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন ||

এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,

দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ||

ঠাকুরাণি, তুমি তাঁহাকে দেখিয়া ত জীবধারণ করিবে। আমি তোমার দাসী হইয়াছি, আমার ত তাহাতে পেট ভরিবে না, আমি কি খেয়ে বাঁচিব?"

মৃ। আমি দুই একটি শিল্পকর্ম জানি। মালা গাঁথিতে জানি, চিত্র করিতে জানি, কাপড়ের ফুল তুলিতে জানি। তুমি বাজারে আমার শিল্পকর্ম বিক্রয় করিয়া দিবে।

গিরি। আর আমি ঘরে ঘরে গীত গায়িব। "মৃণাল অধমে" গাইব কি?

মৃণালিনী অর্ধহাস্য, অর্ধ সকোপ দৃষ্টিতে গিরিজায়ার প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, "অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত গায়িব।" এই বলিয়া গায়িল,

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।

কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিল, "যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "আগে কি জানি।" বলিয়া গায়িতে লাগিল,

"ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,

মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।

এখন - গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,

কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিল, "কূলে ফিরিয়া যাও না কেন?"

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

"মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি

কূলেতে কন্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "তবে ডুবিয়া মর না কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু" বলিয়া আবার গায়িল,

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,

সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, এ কোন অপ্রেমিকের গান।"

গি। কেন?

মৃ। আমি হইলে তরী ডুবাই।

গি। সাধ করিয়া?

মৃ। সাধ করিয়া।

গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাতায়নে

হেমচন্দ্র কিছু দিন উপবনগৃহে বাস করিলেন। জনার্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরতাপ্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র। মনোরমার সহিতও সর্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোরমা কখন তাঁহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন বা বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বস্তুত: মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমত: তাঁহার বয়ক্রম: দুরনুমেয়, সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাম্ভীর্যশালিনী দেখিতেন। মনোরমা কি অদ্যাপি কুমারী? হেমচন্দ্র একদিন কথোপকথনচ্ছলে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা?" মনোরমা কহিল, "বলিতে পারি না |" আর এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইয়াছ?" মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, "বলিতে পারি না |"

মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশপর্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ সময় গৌড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবদ্বীপে সসৈন্য সমবেত হইয়া গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্কর্মে দিনযাপন ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, দিগ্বিজয়কে গৃহরক্ষায় রাখিয়া অশ্ব লইয়া একবার গৌড়ে গমন করেন। কিন্তু তথায় মৃণালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, বিনা সাক্ষাতে গৌড়যাত্রায় কি ফলোদয় হইবে? এই সকল আলোচনায় যদিও গৌড়যাত্রায় হেমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন, তথাপি অনুদিন মৃণালিনীচিন্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পর্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মৃণালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় সুখলাভ করিতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে হেমচন্দ্র প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্মল, বিস্তৃত নক্ষত্রখচিত, ক্বচিৎ স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী। নববারি-সমাগমজনিত কল্লোল হেমচন্দ্র শুনিতে পাইতেছিলেন। বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্ল বন্যকুসুমসংস্পর্শে সুগন্ধি; চন্দ্রকরপ্রতিঘাতী-শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীরবিরাজিত কাশকুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছিল। হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল-চন্দ্রালোকের গতি রোধ হইল। হেমচন্দ্র বাতায়নসন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। বাতায়ন, ভূমি হইতে কিছু উচ্চ-এজন্য কাহারও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না-কেবল একখানি মুখ দেখিলেন। মুখখানি অতি বিশালশ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ। সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, বাতায়নের নিকটে, সম্মুখে শ্মশ্রুসংযুক্ত উষ্ণীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, হেমচন্দ্র শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন।

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন যে, বাতায়নে আর মনুষ্যমুণ্ড নাই।

হেমচন্দ্র অসিহস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাতায়নতলে আসিলেন। তথায় কেহ নাই।

গৃহের চতু:পার্শ্বে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচন্দ্র ইতস্তত: অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকে দেখিলেন না।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধৃবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন। অকালজলদোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাপীকূলে

অকালজলদোদয়স্বরূপ ভীমমূর্তি রাজপুত্র হেমচন্দ্র তুরকের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন আহার্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তুরকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না।

হেমচন্দ্র একটিমাত্র তুরক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্বচর। যদি তুরকসেনাই আসিয়া থাকে, তবে উৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। যে মহৎকার্য জন্য মৃণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া সে কর্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষ যবনবধে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ। উষ্ণীষধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি তাঁহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্থির হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন।

উপবনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরল-লোক-প্রবাহ গ্রাম্য পথ মাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন। সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত, সুরম্য সোপানাবলিশোভিত এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাপার্শ্বে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্বত্থ, বট, আম্র, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি যে সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত ছিল, এমত নহে, বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া বাপীতীরে ঘনান্ধকার করিয়া রহিত। দিবসেও তথায় অন্ধকার। কিম্বদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতিবাসীদিগের মনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সচরাচর তথায় কেহ যাইত না। যদি যাইত, তবে একাকী কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

পৌরাণিক ধর্মের একাধিপত্যকালে হেমচন্দ্রও ভূতযোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু প্রেতসম্বন্ধে প্রত্যয়শালী বলিয়া তিনি গন্তব্য পথে যাইতে সঙ্কোচ করেন, এরূপ ভীরুস্বভাব নহেন। অতএব তিনি নি:সঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন। নি:সঙ্কোচ বটে, কিন্তু কৌতূহলশূন্য নহেন। বাপীর পার্শ্বে সর্বত্র এবং তত্তীরপ্রতি অনিমেষলোচন নিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিলেন। সোপানমার্গের নিকটবর্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জনশ্রুতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্বাধ:স্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। প্রেত বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র নি:শব্দে নি:শব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয়? এত রাত্রে কে এ স্থানে? সে ত তুরককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাপীতীরারোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রেতিনী তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও সরিল না, পূর্বমত রহিল। হেমচন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিলেন। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিল; হস্তদ্বারা মুখাবরণকারী কেশদাম অপসৃত করিল। হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখাইলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতেন না। কহিলেন, "কে, মনোরমা! তুমি এখানে?"

মনোরমা কহিল, "আমি এখানে অনেকবার আসি-কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

হে। আমার কর্ম আছে।

ম। এ রাত্রে কি কর্ম্ম?

হে। পশ্চাৎ বলিব; এ রাত্রে এখানে কেন?

ম। তোমার এ বেশ কেন? হাতে শূল; কাঁকালে তরবারি; তরবারে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি হীরা? মাথায় এ কি? ইহাতে ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি? এও কি হীরা? এত হীরা পেলে কোথা?

হে। আমার ছিল।

ম। এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে?

হে। আমার নিকট হইতে চোরে কাড়িতে পারে না।

ম। তা এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? তুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ?

হে। তোমার কি বোধ হয়, মনোরমা?

ম। মানুষ মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ করিতে যায় না। তুমি যুদ্ধে যাইতেছ।

হে। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমিই বা এখানে কি করিতেছিলে?

ম। স্নান করিতেছিলাম। স্নান করিয়া বাতাসে চুল শুকাইতেছিলাম। এই দেখ, চুল এখনও ভিজা রহিয়াছে।

এই বলিয়া মনোরমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পর্শ করাইলেন।

হে। রাত্রে স্নান কেন?

ম। আমার গা জ্বালা করে।

হে। গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন?

ম। এখানকার জল বড় শীতল।

হে। তুমি সর্ব্বদা এখানে আইস?

ম। আসি।

হে। আমি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি-তোমার বিবাহ হইবে। বিবাহ হইলে এরূপ কি প্রকারে আসিবে?

ম। আগে বিবাহ হউক।

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, “তোমার লজ্জা নাই-তুমি কালামুখী।”

ম। তিরস্কার কর কেন? তুমি যে বলিয়াছিলে, তিরস্কার করিবে না।

হে। সে অপরাধ লইও না। এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?

ম। দেখিয়াছি।

হে। তাহার কি বেশ?

ম। তুরকের বেশ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, “সে কি? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে?”

ম। আমি পূর্বে তুরক দেখিয়াছি।

হে। সে কি? কোথায় দেখিলে?

ম। যেখানে দেখি না-তুমি কি সেই তুরকের অনুসরণ করিবে?

হে। করিব-সে কোন্ পথে গেল?

ম। কেন?

হে। তাহাকে বধ করিব।

ম। মানুষ মেরে কি হবে?

হে। তুরক আমার পরম শত্রু।

ম। তবে একটি মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে?

হে। আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব।

ম। পারিবে?

হে। পারিব।

মনোরমা বলিল, “তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস।”

হেমচন্দ্র ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। যবনযুদ্ধে এই বালিকা পথপ্রদর্শিনী!

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, "আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?"

হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন-মনোরমা কি মানুষী?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পশুপতি

গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতি অসাধরণ ব্যক্তি; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। রাজা বৃদ্ধ, বার্ধক্যের ধর্ম্মানুসারে পরমতাবলম্বী এবং রাজকার্যে অযত্নবান হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানামাত্য ধর্মাধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল। এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতির বয়:ক্রম পঞ্চত্রিংশং বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দিরস্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞানগাম্ভীর্যব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পুরুষভাবপ্রকাশক। তাহা হইলে কি হয়, রাজসভাতলে তাঁহার ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণত হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশত: বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের পর কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশত: একাল পর্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামানয়ননি:সৃত জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।

আজি রাত্রে সেই উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে পশুপতি একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতেই আম্রকানন। আম্রকাননে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে, মৃদু মৃদু কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান। হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি, তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন।

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, "বুঝিলাম আপনি তুরকসেনাপতির বিশ্বাসপাত্র। সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। আপনারই নাম মহম্মদ আলি? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

যবন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতে তিন ভাগ ফরাসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলিরই সৃষ্ট সংস্কৃত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন। পাঠক মহাশয়ের সে কষ্টভোগের প্রয়োজন নাই, আমরা তাঁহার সুবোধার্থ সে নূতন সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

যবন কহিল, “খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্‌পণ করিবেন?”

পশুপতি কহিলেন, “আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না, তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কর্ম কেন করিব?”

য। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন?

প। তাঁহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পর্যন্ত, তাহা জানিবার জন্য।

য। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া দিই। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ।

প। মনুষ্যযুদ্ধে, পশুযুদ্ধে চ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ?

মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, “গৌড়ের যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসা পশুযুদ্ধেই আসা। বুঝিলাম, ব্যঙ্গ করিবার জন্যই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমরা যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি না। যাহা জানি, তাহা করিব|”

এই বলিয়া মহম্মদ আলি গমনোদ্যোগী হইল। পশুপতি কহিলেন, “ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আর কিছু শুনিয়া যান। আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি; অক্ষমও নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেনরাজা নামমাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব?”

মহম্মদ আলি কহিলেন, “আপনি কি চাহেন?”

প। খিলিজি কি দিবেন?

য। আপনার যাহা আছে, তাহা সকলই থাকিবে-আপনার জীবন, ঐশ্বর্য পদ সকলই থাকিবে। এই মাত্র।

প। তবে আমি পাইলাম কি? এ সকলই ত আমার আছে-কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিব?

য। আমাদের আনুকূল্য না করিলে কিছুই থাকিবে না; যুদ্ধ করিলে, আপনার ঐশ্বর্য পদ, জীবন পর্যন্ত অপহৃত হইবে।

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না। আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিবেন না। বিশেষ মগধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হইতেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জন্য এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত, গৌড়জয় চেষ্টা আপাতত: কিছু দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন না দিবেন; কিন্তু যুদ্ধ যদি স্থির হয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম সময়। যখন বিহারে বিদ্রোহিসেনা সজ্জিত হইবে, গৌড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে।

ম। ক্ষতি কি? পিঁপড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুরস্কার কি, তাহা শুনিয়া যাইতে বাসনা করি।

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, কিন্তু লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোপ হইয়া পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন? আমাদিগকে কি দিবেন?

প। রাজকর মাত্র। মুসলমানের অধীনে করপ্রদ মাত্র রাজা হইব।

ম। ভাল; আপনি যদি প্রকৃত গৌড়েশ্বর, রাজা যদি আপনার এরূপ করতলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত আপনার কথাবার্তার আবশ্যক কি? আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন কি? আমাদিগকে কর দিবেন কেন?

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব। ইহাতে কপটতা করিব না। প্রথমত: সেনরাজ আমার প্রভু; বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন। স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করি-তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া, আনুকূল্যে বিনা যুদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে সে নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়ত: রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত হইলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়ত: আমি স্বয়ং রাজা হইলে এক্ষণে সেনরাজার সহিত আপনাদিগের যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আমাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে। যুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি- কিন্তু জয় পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। জয় হইলে আমার নূতন কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু পরাজয়ে সর্বস্বহানি। কিন্তু আপনাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। বিশেষত: সর্বদা যুদ্ধোদ্যত থাকিতে হইলে নূতন রাজ্য সুশাসিত হয় না।

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজ একেশ্বর হইবেন, অন্য রাজার নামমাত্র আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে গৌড়ে শাসনকর্তা করিব। যেমন দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন, যেমন পূর্বদেশে কুতবউদ্দীনের প্রতিনিধি বখ্‌ঘতিয়ার খিলিজি, তেমনই গৌড়ে আপনি বখ্তিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে স্বীকৃত আছেন কি না?

পশুপতি কহিলেন, "আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।"

ম। ভাল; কিন্তু আমার আর এক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি?

প। আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে। আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ হইবে না। পাঁচজন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে বলিও; কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না, "কে তোমরা?"

ম। আরও এক কথা বাকি আছে। এই দেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রেই তাহার মুণ্ড যবন-শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।

প। আপনারা আসিয়াই তাহা ছেদন করিবেন-আমি শরণাগত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব?

ম। আমাদিগের হইতে হইবে না। যবন-সমাগম শুনিবামাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে। আজি সে নিশ্চিন্ত আছে। আজি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বধ করুন।

প। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

ম। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

প। যে আজ্ঞা। আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

ম। কি, আজ্ঞা করুন।

প। আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে যদি আপনারা আমাকে বহিষ্কৃত করেন?

ম। আমরা আপনার কথায় নির্ভর করিয়া অল্পমাত্র সেনা লইয়া দূত পরিচয়ে পুরপ্রবেশ করিব। তাহাতে যদি আমরা স্বীকার মত কর্ম না করি, আপনি সহজেই আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

প। আর যদি আপনারা অল্প সেনা লইয়া না আইসেন?

ম। তবে যুদ্ধ করিবেন।

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : চৌরোদ্ধরণিক

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্য এক জন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "প্রবেশ করিব?"

পশুপতি কহিলেন, "কর।"

একজন চৌরোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত হইলে পশুপতি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শান্তশীল! মঙ্গল সংবাদ ত?"

চৌরোদ্ধরণিক কহিল, "আপনি একে একে প্রশ্ন করুন-আমি ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

প। যবনদিগের অবস্থিতি স্থানে গিয়াছিলে?

শা। সেখানে কেহ যাইতে পারে না।

প। কেন?

শা। অতি নিবিড় বন, দুর্ভেদ্য।

প। কুঠারহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে গেলে না কেন?

শা। ব্যাঘ্র ভল্লুকের দৌরাত্ম্য।

প। সশস্ত্রে গেলে না কেন?

শা। যে সকল কাঠুরিয়ারা ব্যাঘ্র ভল্লুক বধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই যবন-হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে-কেহই ফিরিয়া আইসে নাই।

প। তুমিও না হয় না আসিতে?

শা। তাহা হইলে কে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিত?

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তুমিই আসিতে।"

শান্তশীল প্রণাম করিয়া কহিল, "আমিই সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

শান্তশীল আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে গেলে?"

শা। প্রথমে উষ্ণীষ অস্ত্র ও তুরকী বেশ সংগ্রহ করিলাম। তাহা বাঁধিয়া পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিলাম। তার উপর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বন-পথে প্রবেশ করিলাম। পরে যখন যবনেরা কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল- তখন আমি অপসৃত হইয়া বৃক্ষান্তরালে বেশ পরিবর্তন করিলাম। পরে মুসলমান হইয়া যবনশিবিরে সর্বত্র বেড়াইলাম।

প। প্রশসংনীয় বটে। যবন-সৈন্য কত দেখিলে?

শা। সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয়, পঁচিশ হাজার হইবে।

পশুপতি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "তাহাদিগের কথাবার্তা কি শুনিলে?"

শা। বিস্তর শুনিলাম-কিন্তু তাহার কিছুই আপনার নিকট নিবেদন করিতে পারিলাম না।

প। কেন?

শা। যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি।

পশুপতি হাস্য করিলেন। শান্তশীল তখন কহিলেন, "মহম্মদ আলি এখানে যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ আশঙ্কা করিতেছি।"

মৃণালিনী

শা। তিনি অলক্ষিত হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, "কিসে জানিলে?"

শান্তশীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণ দর্শনে আসিবার সময় দেখিলাম যে, বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল। তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝিলাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না।"

প। তার পর?

শা। তার পর দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

পশুপতি চৌরাদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, "কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি বিহিত করা যাইবেক। আজি রাত্রিতে সে কারারুদ্ধই থাক। এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য সাধন করিতে হইবে। যবন-সেনাপতির ইচ্ছা, অদ্য রাত্রিতে তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শন করেন। তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে।"

শা। কার্য নিতান্ত সহজ নহে। রাজপুত্র পিঁপড়ে মাছি নন।

প। আমি তোমাকে একা যুদ্ধে যাইতে বলিতেছি না। কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবে।

শা। লোকে কি বলিবে?

প। লোকে বলিবে, দস্যুতে তাঁহাকে মারিয়া গিয়াছে।

শা। যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম।

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। পরে গৃহাভ্যন্তরে যথা বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত মন্দিরে অষ্টভুজা মূর্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া প্রতিমাগ্রে সাষ্টাগ্রে প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া যুক্ত করে ভক্তিভাবে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, "জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম- দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কন্টকের দ্বারা কন্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কন্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি যবন-সহাতায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎপ্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।"

এই বলিয়া পশুপতি পুনরপি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন-শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়া দেখিলেন-অপূর্ব দর্শন-

সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন-শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।

তরুণী বীণানিন্দিত স্বরে কহিলেন, "পশুপতি!"

পশুপতি দেখিলেন-মনোরমা।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ : মোহিনী

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনোরমা নিতান্ত খর্বাকৃতা নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি

অনির্বচনীয় কোমল, অনির্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা বয়সের ঔদার্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়:ক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়:ক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল-চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গ-শিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্ধচন্দ্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মুহুর্মুহ: আকুঞ্চন-বিস্ফোরণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাত:শিশিরে সিক্ত প্রাত:সূর্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা- বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশসকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত-সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে। মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাঁহার সর্বাঙ্গীন সৌকুমার্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য; সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথসময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য; আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,-পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্ধ্বস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে, ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্যোদয়ে সদ্য:প্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ : মোহিতা

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য-সাগরের এক অপূর্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগ্নআভ বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ?-এ কি? আজি তোমার এ ভাব কেন?"

মনোরমা উত্তর করিলেন, "আমার কি ভাব দেখিলে?"

প। তোমার দুই মূর্তি-এক মূর্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা-সে মূর্তিতে কেন আসিলে না?-সেইরূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্তি গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী-এ মূর্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, তুমি কেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজি তুমি এ মূর্তিতে আমাকে ভয় দেখাইতে কেন আসিয়াছ?

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ?

প। আমি রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলাম-কিন্তু তুমি-

ম। পশুপতি, আবার? রাজকার্যে না নিজকার্যে?

প। নিজকার্যই বল। রাজকার্যেই হউক, আর নিজকার্যেই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি? তুমি আজি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

ম। আমি সকল শুনিয়াছি।

প। কি শুনিয়াছ?

ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা-শান্তশীলের সঙ্গে মন্ত্রণা-দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘান্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম - না হয় তুমি আগে শুনিয়াছ। তুমি কোন্ কথা না জান?"

ম। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?

প। কেন, মনোরমা? তোমারই জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব: কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলিন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন প দ্ধতি প্রচলিত করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পশুপতি, সে সকল আমার স্বপ্ন মাত্র। তুমি রাজা হইলে, আমার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমি কখনও তোমার মহিষী হইব না।"

প। কেন মনোরমা?

ম। কেন? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আর কি আমায় ভালবাসিবে? রাজ্যই তোমার হৃদয়ে প্রধান স্থান পাইবে!-তখন আমার প্রতি তোমার অনাদর হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিলে-তবে আমি কেন তোমার পত্নীত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িব?

প। এ কথাকে কেন মনে স্থান দিতেছ? আগে তুমি-পরে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজা হইয়া যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না। তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। স্ত্রৈণ-রাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; কহিলেন, "যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি? না হয়, তাহাই হউক। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিব।"

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন? ত্যাগের জন্য গ্রহণে ফল কি?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।

ম। সে আশা ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।

প। কেন, মনোরমা! আমি কি অপরাধ করিলাম?

ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক-আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব?

প। কেন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম?

ম। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা করিতেছ; ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম নয়? যে প্রভুর বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন?

পশুপতি নীরব হইয়া রহিলেন। মনোরমা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর।"

পশুপতি পূর্ববৎ অধোবদনে রহিলেন। তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়। সেও অত্যাজ্য। উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। "যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি?" এইরূপ পুন: পুন: মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে; সকলের ঘৃণিত হইব। তাহা কি প্রকারে সহিব?" পশুপতি নীরব রহিলেন; কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।

অমনই মনোরমা আবার ফিরিল। আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিল। পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তেজোগর্ববিশিষ্টা, কুঞ্চিতভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী মূর্তি আর নাই; সে প্রতিভা দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন; কুসুমসুকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন?"

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, "তোমার কথায়।"

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?

ম। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।

মৃণালিনী
দশম পরিচ্ছেদ : ফাঁদ

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্তী হইয়া যবন-সন্ধানে আসিতেছিলেন। মনোরমা ধর্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, "সম্মুখে এই অট্টালিকা দেখিতেছ?"

হে। দেখিতেছি।

ম। এখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।

হে। কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরমা কহিলেন, "তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে |"

হে। তুমি কোথায় যাইবে?

ম। আমিও এ বাড়ীতে যাইব।

হেমচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। মনোরমার আচরণ দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তাহার পরামর্শানুসারে পথিপার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। মনোরমা গুপ্তপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শান্তশীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। শান্তশীল সন্দেহপ্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে চৌর অনুমানে কহিল, "কে তুমি? এখানে কি করিতেছ?" পরে তৎক্ষণে হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কারশোভিত যোদ্ধৃবেশ দেখিয়া কহিল, "আপনি কে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যে হই না কেন?"

শা। আপনি এখানে কি করিতেছেন?

হে। আমি এখানে যবনানুসন্ধান করিতেছি।

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, "যবন কোথায়?"

হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তশীল ভীত ব্যক্তির ন্যায় স্বরে কহিল, "এ গৃহে কেন?"

হে। তাহা আমি জানি না।

শা। এ গৃহ কাহার?

হে। তাহা জানি না।

শা। তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, এই গৃহে যবন প্রবেশ করিয়াছে?

হে। তা তোমার শুনিয়া কি হইবে?

শা। এই গৃহ আমার। যদি যবন হইতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্টকামনা করিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যোদ্ধা এবং যবনদ্বেষী দেখিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে তবে আমার সঙ্গে আসুন-উভয়ে চোরকে ধৃত করিব।

হেমচন্দ্র সম্মত হইয়া শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। শান্তশীল সিংহদ্বার দিয়া পশুপতির গহে হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণ রত্নাদি সকল আছে আপনি ইহার প্রহরায় অবস্থিতি করুন। আমি ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন লুক্কায়িত আছে |"

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং হেমচন্দ্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহির দিকে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন। হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : মুক্ত

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিল। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিল যে, ঐ ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আসিয়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিল। হেমচন্দ্রকে কহিল, "হেমচন্দ্র, বাহির হইয়া যাও |"

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিলেন। মনোরমা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তখন হেমচন্দ্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন?"

ম। তাহা পরে বলিব।

হে। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে?

ম। শান্তশীল।

হে। শান্তশীল কে?

ম। চৌরাদ্ধরণিক।

হে। এই কি তাহার বাড়ী?

ম। না।

হে। এ কাহার বাড়ী?

ম। পরে বলিব।

হে। যবন কোথায় গেল?

ম। শিবিরে গিয়াছে।

হে। শিবির! কত যবন আসিয়াছে?

ম। পঁচিশ হাজার।

হে। কোথায় তাহাদের শিবির?

ম। মহাবনে।

হে। মহাবন কোথায়?

ম। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে।

হেমচন্দ্র করলগ্নকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মনোরমা কহিল, "ভাবিতেছ কেন? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে?"

হে। পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একের যুদ্ধ সম্ভবে?

ম। তবে কি করিবে-ঘরে ফিরিয়া যাইবে?

হে। এখন ঘরে যাব না।

ম। কোথা যাবে?

হে। মহাবনে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন?

হে। যবনদিগকে দেখিতে।

ম। যুদ্‌ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে?

হে। দেখিতে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহাদিগকে মারিতে পারিব।

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিশ হাজার মানুষ মারিবে? কি সর্বনাশ! ছি! ছি!"

হে। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে?

ম। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্য তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজি ঘরে যাইও না।

এই বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অতিথি-সৎকার

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন; এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন; তৎপরে প্রান্তর। প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন। দেখিলেন, স্কন্ধে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, তিন জন অশ্বারোহী আসিতেছে।

হেমচন্দ্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান করিল। হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন।

অশ্বারোহিগণ পুনর্বার একেবারে শরসংযোগ করিল। এবং তাহা নিবারিত হইতে না হইতেই পুনর্বার শরত্রয় ত্যাগ করিল।

এইরূপ অবিরত হস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্নাদিমণ্ডিত চর্ম হস্তে লইলেন, এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই শরজালবর্ষণ নিরাকরণ করিতে লাগিলেন; কদাচিৎ দুই এক শর অশ্বশরীরে বিদ্ধ হইল মাত্র। স্বয়ং অক্ষত রহিলেন।

বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহিত্রয় নিরস্তর হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র সেই অবকাশে একজনের প্রতি এক শরত্যাগ করিলেন। সে অব্যর্থ সন্ধান। শর একজন অশ্বারোহীর ললাটমধ্যে বিদ্ধ হইল। সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ধরাতলশায়িত হইল।

তৎক্ষণাৎ অপর দুই জনে অশ্বে কশাঘাত করিয়া, শূলযুগল প্রণত করিয়া হেমচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। এই শূলক্ষেপযোগ্য নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল। যদি তাহারা হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শূল ত্যাগ করিত, তবে হেমচন্দ্রের বিচিত্র শিক্ষায় তাহা নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া আক্রমণকারীরা হেমচন্দ্রের অশ্বপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শূলত্যাগ করিয়াছিল। ততদূর অধ:পর্যন্ত হস্তসঞ্চালনে হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। একের শূল নিবারিত হইল, অপরের নিবারিত হইল না। শূল অশ্বের গ্রীবাতলে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র সে রমণীয় ঘোটক মুমূর্ষু হইয়া ভূতলে পড়িল।

সুশিক্ষিতের ন্যায় হেমচন্দ্র পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। এবং পলকমধ্যে নিজ করস্থ করাল শূল উন্নত কহিলেন, "আমার পিতৃদত্ত শূল শত্রুরক্ত পান না করিয়া কখন ফেরে নাই।" তাঁহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন করিল। সেই শান্তশীল।

হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্কন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। তীর কিছু অধিক মাংসভেদ করিয়াছিল -মোচন মাত্র অতিশয় শোণিতস্রুতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র নিজ বস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। ক্রমে হেমচন্দ্র রক্তক্ষতি হেতু দুর্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, যবন-শিবিরে গমনের অদ্য আর কোন সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হইয়াছে-নিজবল হত হইতেছে। অতএব অপ্রসন্ন মনে, ধীরে ধীরে, নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। তখন শরীর নিতান্ত অবশ হইয়া আসিল - শোণিতস্রোতে সর্বাঙ্গ আর্দ্র হইল; গতিশক্তি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। কষ্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর যাইতে পারেন না। এই কুটীরের নিকট বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। রাত্রিজাগরণ-সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম-রক্তস্রাবে বলহানি-এই সকল কারণে হেমচন্দ্রের চক্ষুতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল-নিদ্রা প্রবল হইল-চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গায়িতেছে,

“কন্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে |”

## তৃতীয় খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ : “উনি তোমার কে?”

যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটীরমধ্যে এক পাটনী বাস করিত। কুটীরমধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন হইত। অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশুসন্তান সকল লইয়া শয়ন করিত। তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী কন্যা রত্নময়ী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল। সেই দুইটি স্ত্রীলোক পাঠক মহাশয়ের নিকট পরিচিতা; মৃণালিনী আর গিরিজায়া নবদ্বীপে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

একে একে তিনটি স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগরিতা হইল। প্রথমে রত্নময়ী জাগিল। গিরিজায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “সই?”

গি। কি সই?

র। তুমি কোথায় সই?

গি। বিছানাসই।

র। উঠ না সই!

গি। না সই।

র। গায়ে জল দিব সই।

গি। জলসই? ভাল সই, তাও সই।

র। নহিলে ছাড়ি কই।

গি। ছাড়িবে কেন সই? তুমি আমার প্রাণের সই-তোমার মত আছে কই? তুমি পারঘাটার রসমই-তোমায় না কইলে আর কারে কই?

র। কথায় সই তুমি চিরজই: আমি তোমার কাছে বোবা হই, আর মিলাইতে পারি কই?

গি। আরও মিল চাই?

র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া রত্নময়ী গৃহকর্মে গেল। মৃণালিনী এ পর্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। এখন গিরিজায়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, জাগিয়াছ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "জাগিয়াই আছি। জাগিয়াই থাকি।"

গি। কি ভাবিতেছিলে?

মৃ। যাহা ভাবি।

গিরিজায়া তখন গম্ভীরভাবে কহিল, "কি করিব? আমার দোষ নাই। আমি শুনিয়াছি, তিনি এই নগরমধ্যে আছেন; এ পর্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আমরা ত সবে দুই তিন দিন আসিয়াছি। শীঘ্র সন্ধান করিব।"

মৃ। গিরিজায়া, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই? তবে যে এই পাটনীর গৃহে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করিতে হইবে। আমার যে যাইবার স্থান নাই।

মৃণালিনী উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও গণ্ডে নীরবস্রুত অশ্রু বহিতে লাগিল।

এমন সময় রত্নময়ী শশব্যস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া কহিল, "সই! সই! দেখিয়া যাও। আমাদিগের বটতলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য পুরুষ!"

মৃণালিনী

গিরিজায়া কুটীরদ্বারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটীরদ্বার পর্যন্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল।

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়া গায়িল,

"কন্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।"

সেই ধ্বনি স্বপ্নবৎ হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃণালিনী গিরিজায়ার কন্ঠকণ্ডূয়ন দেখিয়া কহিলেন, "চুপ, রাক্ষসী আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে না, ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন। উনি যেখানে যান, অদৃশ্যভাবে দূরে থাকিয়া উঁহার সঙ্গে যাও- এ কি! উঁহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন? চল, তবে আমিও সঙ্গে চলিলাম।"

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাত:কাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

হেমচন্দ্র কিয়দ্দূর গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজায়া তাঁহার অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে?”

মৃণালিনী কহিলেন, “দেবতা জানেন|”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিজ্ঞা-পর্বতো বহ্নিমান

বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন। শোণিতস্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল। শূলে ভর করিয়া হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন।

মৃণালিনী ও গিরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাকে দেখিলেন।

মনোরমা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া মৃণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, “আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে|” গিরিজায়া ভাবিল, “রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে|”

হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, “মনোরমা-এমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?”

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না। হেমচন্দ্র পুনরপি ডাকিলেন, “মনোরমা!”

তথাপি উত্তর নাই; হেমচন্দ্র দেখিলেন, আকাশমার্গে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “মনোরমা, কি হইয়াছে?”

তখন মনোরমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিল। এবং কিয়ৎকাল অনিমেষলোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। পরে হেমচন্দ্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল। তখন মনোরমা বিস্মিত হইয়া কহিল, “এ কি হেমচন্দ্র! রক্ত কেন? তোমার মুখ শুষ্ক; তুমি কি আহত হইয়াছ?”

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্কন্ধের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেল। এবং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার আনীত করিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পরিত্যক্ত করাইয়া অঙ্গের রুধির সকল ধৌত করিল। এবং গোজাতিপ্রলোভন নবদুর্বাদল ভূমি হইতে ছিন্ন করিয়া আপন কুন্দনিন্দিত দন্তে চর্বিত করিল। পরে তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিয়া উপবীতাকারে বস্ত্র দ্বারা বাঁধিল। তখন কহিল, “হেমচন্দ্র! আর কি করিব? তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর হইতেছি|”

মৃণালিনী মনোরমার কার্য দেখিয়া চিন্তিতান্ত:করণে গিরিজায়াকে কহিলেন, “এ কে গিরিজায়া?”

গি। নাম শুনিলাম মনোরমা।

মৃ। এ কি হেমচন্দ্রের মনোরমা?

গি। তুমি কি বিবেচনা করিতেছ?

মৃ। আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল। যে কার্যের জন্য আমার অন্ত:করণ দগ্ধ হইতেছিল-মনোরমা সে কার্য সম্পন্ন করিল-দেবতারা উহাকে আয়ুষ্মতী করুন। গিরিজায়া, আমি গৃহে চলিলাম, আমার আর থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন থাকেন, সংবাদ লইয়া যাইও। মনোরমা যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হেতু-ধূমাৎ

মনোরমা এবং হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মৃণালিনীকে বিদায় দিয়া গিরিজায়া উপবনগৃহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে বাতায়ন-পথ মুক্ত দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক কক্ষে হেমচন্দ্রকে শয়ানাবস্থায় দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার শয্যোপরি মনোরমা বসিয়া আছে। গিরিজায়া সেই বাতায়নতলে উপবেশন করিলেন। পূর্বরাত্রে সেই বাতায়ন-পথে যবন হেমচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিরিজায়ার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হেমচন্দ্র মনোরমার কি কথোকথন হয়, তাহা বিরলে থাকিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোকথনই ত হয় না। একাকী নীরবে সেই বাতায়ন-তলে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল। কথা কহিতে পায় না, হাসিতে পায় না, ব্যঙ্গ করিতে পারে না, বড়ই কষ্ট-স্ত্রীরসনা কণ্ডুয়িত হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল-সেই পাপিষ্ঠ দিগ্বিজয়ই বা কোথায়? তাহাকে পাইলেও ত মুখ খুলিয়া বাঁচি। কিন্তু দিগ্বিজয় গৃহমধ্যে প্রভুর কার্যে নিযুক্ত ছিল-তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। তখন অন্য পাত্রাভাবে গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোকথন আরম্ভ করিল। সে কথোপকথন শুনিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহা জানাইতে পারি। গিরিজায়াই প্রশ্নকর্ত্রী, গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী।

প্র। ওলো, তুই বসিয়া কে লো?

উ। গিরিজায়া লো।

প্র। এখানে কেন লো?

উ। মৃণালিনীর জন্য লো।

প্র। মৃণালিনী তোর কে?

উ। কেউ না।

প্র। তবে তার জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

উ। আমার আর কাজ কি? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব?

প্র। মৃণালিনীর জন্যে এখানে কেন?

উ। এখানে তার একটি শিকলীকাটা পাখী আছে।

প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি?

উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে?

প্র। তবে বসিয়া কেন?

উ। দেখি, শিকল কেটেছে কি না।

প্র। কেটেছে না কেটেছে, জেনে কি হইবে?

উ। পাখীটির জন্যে মৃণালিনী প্রতিরাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে-আজি না জানি কতই কাঁদবে। যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে।

প্র। আর যদি শিকল কেটে থাকে?

উ। মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া হয়েছে-রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঁজরা খালি রাখিও না।

প্র। মর্ ভিখারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি! মৃণালিনী যদি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়া ফেলে?

উ। ঠিক বলেছিস সই! তা সে পারে। বলা হবে না।

প্র। তবে এখানে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া মরিস কেন?

উ। বড় মাথা ধরিয়াছে, তাই। এই যে মেয়েটা ঘরের ভিতর বসিয়া আছে-এ মেয়েটা বোবা-নহিলে এখনও কথা কয় না কেন? মেয়েমানুষের মুখ এখনও বন্ধ?

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। হেমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, ঘুম হয়েছে?”

হে। বেশ ঘুম হয়েছে।

ম। এখন বল, কি প্রকারে আঘাত পাইলে?

তখন হেমচন্দ্র রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মনোরমা চিন্তা করিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার জিজ্ঞাস্য শেষ হইল। এখন আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সকল বল।"

মনোরমা মৃদু মৃদু অস্ফুটস্বরে কি বলিল, গিরিজায়া তাহা শুনিতে পাইল না। বুঝিল, চুপি চুপি কি কথা হইল।

গিরিজায়া আর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া গাত্রোত্থান করিল। তখন পুনর্বার প্রশ্নোত্তরমালা মনোমধ্যে গ্রথিত হইতে লাগিল।

প্র। কি বুঝিলে?

উ। কয়েকটি লক্ষণ মাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ?

গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল, এক-মেয়েটি আশ্চর্য সুন্দরী; আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ় থাকে? দুই-মনোরমা ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন করিল কেন? তিন-একত্রে বাস। চারি-একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ-চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি?

উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই।

প্র। কিন্তু মৃণালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে। তবে ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই।

উ। যথার্থ। কিন্তু মৃণালিনী অনুপস্থিত, মনোরমা উপস্থিত।

এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "ভিক্ষা দাও গো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উপনয়-বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্

গিরিজায়া গীত গায়িল,

"কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?

ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,

ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিল।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

"ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,

ব্রজবধূ টুটায়ল পরাণ।”

হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

“মিলি সেই নাগরী, ভুলি সেই মাধব,

রূপবিহীন গোপকুঙারী।

কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,

হেন বঁধূ রূপকি ভিখারী ॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “এ কি! মনোরমা, এ যে গিরিজায়ার স্বর! আমি চলিলাম।” এই বলিয়া লম্ফ দিয়া হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

“আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,

হৃদি বৈনু চরণ যুগল।

যমুনা-সলিলে সই, তব তনু ডারব,

আন সখি ভখিব গরল ॥”

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত স্বরে কহিলেন, “গিরিজায়া। এ কি গিরিজায়া! তুমি এখানে? তুমি এখানে কেন? তুমি এ দেশে কবে আসিলে?”

গিরিজায়া কহিল, “আমি এখানে অনেক দিন আসিয়াছি।” এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল,

“কিবা কাননবল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,

নবীন তমালে দিব ফাঁস।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি এ দেশে কেন এলে?”

গিরিজায়া কহিল, “ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। রাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি-

কিবা কাননবল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,

নবীন তমালে দিব ফাঁস।”

হেমচন্দ্র গীতে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, “মৃণালিনী কেমন আছে; দেখিয়া আসিয়াছ?

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

“নহে-শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি,

ছার তনু করব বিনাশ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার গীত রাখ। আমার কথার উত্তর দাও! মৃণালিনী কেমন আছে, দেখিয়া আসিয়াছ?”

গিরিজায়া কহিল, “মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই। এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্য গীত গায়িতেছি।

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।

কিবা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “গিরিজায়া তোমাকে মিনতি করিতেছি-গান রাখ, মৃণালিনীর সংবাদ বল।”

গি। কি বলিব?

হে। মৃণালিনীকে কেন দেখিয়া আইস নাই?

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই।

হে। কেন? কোথায় গিয়াছেন?

গি। মথুরায়।

হে। মথুরায়? মথুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন? কি প্রকারে গেলেন? কেন গেলেন?

গি। তাঁহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বুঝি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত। বুঝি বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছেন।

হে। কি? কি করিতে?

গি। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। গিরিজায়া সে মুখ দেখিতে পাইল না; আর যে হেমচন্দ্রের স্কন্ধস্থ ক্ষতমুখ ছুটিয়া বন্ধনবস্ত্র রক্তে প্লাবিত হইতেছিল, তাহাও দেখিতে পাইল না। সে পূর্বমত গায়িল,

“বিধি তোরে সাধি শুন,  জন্ম যদি দিবে পুন,

আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে।

লাজ ভয় তেয়াগিব  এ সাধ মোর পুরাইব,

সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিবে ||”

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, “গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে |”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুন: প্রবেশ করিলেন। গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গিরিজায়া মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া মৃণালিনীর বিবাহের কথা বলিয়া সে হেমচন্দ্রের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মনে করিয়াছিল যে, মৃণালিনী বিবাহ উপস্থিত শুনিয়া হেমচন্দ্র বড় কাতর হইবে, বড় রাগ করিবে। কৈ, তা ত কিছুই হইল না। তখন গিরিজায়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিল, “হায় কি করিলাম! কেন অনর্থক মিথ্যা কথা রটনা করিলাম। হেমচন্দ্র ত সুখী হইল দেখিতেছি - বলিয়া গেল - সংবাদ শুভ। এখন ঠাকুরাণীর দশা কি হইবে?” হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন, তোমার সংবাদ শুভ, তাহা, গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ ত নয়-কি বুঝিবে? যে ক্রোধভরে, হেমচন্দ্র, এই মৃণালিনীর জন্য গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই দুর্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল। অভিমানাধিক্যে দুর্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বলিলেন, “তোমার সংবাদ শুভ!”

গিরিজায়া তাহা বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, এই ষষ্ঠ লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না; সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না। “শিকলী কাটিয়াছে” সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আর একটি সংবাদ

সেই দিন মাধবাচার্যের পর্যটন সমাপ্ত হইল। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রেকে দর্শনদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন। এবং আশীর্বাদ, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্নাদির পরে বিরলে উভয়ের উদ্দেশ্য সাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মাধবাচার্য কহিলেন, “এত শ্রম করিয়া কতকদূর কৃতকার্য হইয়াছি। এতদ্দেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সেন রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইবেন |”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাঁহারা অদ্যই এ স্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবনসেনা আসিয়াছে, মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে। আজি কালি নগর আক্রমণ করিবে |”

মাধবাচার্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “গৌড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে?”

হে। কিছুই না। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে এ সংবাদ এ পর্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিয়া সৎপরামর্শ দাও নাই কেন?

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিলাম। এই মাত্র গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি। বলহানিপ্রযুক্ত রাজসমক্ষে যাইতে পারি নাই। এখনই যাইতেছি।

মা। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট যাইতেছি। পশ্চাৎ যেরূপ হয় তোমাকে জানাইব।

এই বলিয়া মাধবাচার্য গাত্রোত্থান করিলেন।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু! আপনি গৌড় পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম___"

মাধবাচার্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "গিয়াছিলাম। তুমি মৃণালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? মৃণালিনী তথায় নাই।"

হে। কোথায় গিয়াছে?

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না।

হে। কেন গিয়াছে?

মা। বৎস! সে সকল পরিচয় যুদ্ধান্তে দিব।

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "স্বরূপ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্মপীড়ায় কাতর হইব, সে আশঙ্কা করিবেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা নি:সঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

মাধবাচার্য গৌড়নগরে গমন করিলে হৃষীকেশ তাঁহাকে আপন জ্ঞানমত মৃণালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া মাধবাচার্যেরও বোধ হইয়াছিল; মাধবাচার্য কস্মিন্‌কালে স্ত্রীজাতির অনুরাগী নহেন-সুতরাং স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন না। এক্ষণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যে, হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্তই কতক কতক শ্রবণ করিয়া মৃণালিনীর কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন-অতএব কোন নূতন মন:পীড়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পুনর্বার আসনগ্রহণপূর্বক হৃষীকেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র অধোমুখে করতলোপরি ভ্রূকুটিকুটি ললাট সংস্থাপিত করিয়া নি:শব্দে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মাধবাচার্যের কথা সমাপ্ত হইলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচার্য ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র!" কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরপি ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র!" তথাপি নিরুত্তর।

তখন মাধবাচার্য গাত্রোত্থান করিয়া হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন; অতি কোমল, স্নেহময় স্বরে কহিলেন, "বৎস! তাত! মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও!"

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্যও ভীত হইলেন। মাধবাচার্য কহিলেন, "আমার সহিত আলাপ কর। ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা ব্যক্ত কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? হৃষীকেশ একরূপ কহিয়াছে। ভিখারিণী আর এক প্রকার বলিল।"

মাধবাচার্য কহিলেন, "ভিখারিণী কে? সে কি বলিয়াছে?"

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন, "হৃষীকেশেরই কথা মিথ্যা বোধ হয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "হৃষীকেশের প্রত্যক্ষ।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নি:শব্দে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

হেমচন্দ্র করস্থ শূল দেখাইয়া কহিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইয়া অপসৃত হইলেন।

প্রাতে মৃণালিনী বলিয়া গিয়াছিলেন, "হেমচন্দ্র আমারই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : "আমি ত উন্মাদিনী"

অপরাহ্নে মাধবাচার্য প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন যে, ধর্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যবনসেনা আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বজিত রাজ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা শুনিয়া যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামীকল্য তাঁহারা দূত প্রেরণ করিবেন। দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য কহিলেন, "এই কুলাঙ্গার রাজা ধর্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।"

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য বিদায় হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিল, "ভাই! আজ তুমি অমন কেন?"

হে। কেমন আমি?

ম। তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; ভাদ্র মাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; অত ভ্রূকুটি করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন-আর দেখি-তাই ত, চোখে জল; তুমি কেঁদেছ?

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; আবার চক্ষু অবনত করিলেন; পুনর্বার উন্নত গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিলেন; আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বুঝিল যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির কোন উদ্দেশ্য নাই। যখন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয়। মনোরমা কহিল, "হেমচন্দ্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে?" হেমচন্দ্র কহিলেন, "কিছু না।"

মনোরমা প্রথমে কিছু বলিল না-পরে আপনা আপনি মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিল। "কিছু না-বলিবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে!" বলিতে বলিতে চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি বহিল;-পরে অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের প্রতি মুখপ্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাকে বলিবে না কেন? আমি যে তোমার ভগিনী।"

মনোরমার মুখের ভাবে, শান্তদৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃদুতা, এত সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল যে হেমচন্দ্রের অন্ত:করণ দ্রবীভূত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীয় নহে।"

মনোরমা কহিল, "তবে আমি ভগিনী নহি।"

হেমচন্দ্র কিছুতেই উত্তর করিলেন না। তথাপি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া মনোরমা তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। কহিল, "আমি তোমার কেহ নহি।"

হে। আমার দু:খ ভগিনীর অশ্রাব্য-অপরেরও অশ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর করুণাময়-নিতান্ত আধিব্যক্তিপরিপূর্ণ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল। তখনই সে স্বর পরিবর্তিত হইল, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল-অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমার দু:খ কি? দু:খ কিছুই না। আমি মণি ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।"

মনোরমা আবার পূর্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। বালিকা প্রগল্‌ভতাপ্রাপ্ত হইল। সূর্যরশ্মির অপেক্ষা যে রশ্মি সমুজ্বল, তাহার কিরীট পরিয়া প্রতিভাদেবী দেখা দিলেন। মনোরমা কহিল, "বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হে। ভালবাসিতাম।

হেমচন্দ্র বর্তমানের পরিবর্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে নি:স্রুত অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোরমা বিরক্ত হইল। বলিল, "ছি! ছি! প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা তাহার নিকট সর্বনাশ ঘটে।" মনোরমা বিরক্তিবশত: আপন অলকদাম চম্পকাঙ্গুলিতে জড়িতে করিয়া টানিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "কি প্রতারণা করিলাম?"

মনোরমা কহিল, "ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন? কি? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?" বলিতে বলিতে মনোরমার প্রৌঢ়ভাবাপন্ন মুখকান্তি সহসা প্রফুল্ল পদ্মবৎ অধিকতর পরিস্ফুট, আগ্রহকম্পিত হইতে লাগিল; বলিতে লাগিল, "এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। অহঙ্কার করিয়া আগুন নিবান যায়? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতারক!"

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "আমি ইহাকে এক দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম!"

মনোরমা কহিতে লাগিল, "তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর-পাদ-পদ্ম-নি:সৃত, ইহা জগতে পবিত্র - যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পূণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যঞ্জয়-জটা-বিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ। সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শত পাত্রে ন্যস্ত হয়-পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়-সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।"

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে?

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেন না, প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ তাকে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মনোরমা, এ সকল তোমায় কে শিখাইল? তোমার উপদেষ্টা অলৌকিক ব্যক্তি |"

মনোরমা মুখাবনত করিয়া কহিলেন, "তিনি সর্বজ্ঞানী, কিন্তু___"

হে। কিন্তু কি?

ম। তিনি অগ্নিস্বরূপ-আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।

মনোরমা ক্ষণেক মুখাবনত করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা, তোমার মুখ দেখিয়া, আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, তুমিও ভালবাসিয়াছ। বোধ হয়, যাঁহাকে তুমি অগ্নির সহিত তুলনা করিলে, তিনিই তোমার প্রণয়াধিকারী |"

মনোরমা পূর্ববৎ নীরবে রহিল। হেমচন্দ্র পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার একটি কথা শুন। স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্যেই ঘটে, এমন নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও |"

মনোরমা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল; পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল, হাসি বন্ধ হয় না। হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইলেন, কহিলেন, "হাসিতেছ কেন?"

মনোরমা কহিলেন, "ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্বতে ফিরে যাও |"

হে। কেন?

ম। স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন? রাজপুত্র, কালসর্পকে মনে করিয়া কি সুখ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে ভুলিতেছ না কেন?

হে। তাহার দংশনের জ্বালায়।

ম। আর সে যদি দংশন না করিত? তবে কি তাহাকে ভুলিতে?

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন না। মনোরমা বলিতে লাগিল, "তোমার ফুলের মালা কালসাপ হইয়াছে, তবু তুমি ভুলিতে পারিতেছ না; আমি, আমি ত পাগল-আমি আমার পুষ্পহার কেন ছিঁড়িব? "

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এক প্রকার অন্যায় বলিতেছ না। বিস্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে; লোক আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে 'বিস্মৃত হও' এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। কেহ কাহাকে বলে না,

অর্থচিন্তা ছাড়; যশের ইচ্ছা ছাড়; জ্ঞানচিন্তা ছাড়; ক্ষুধানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর; নিদ্রা ছাড়; তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড়? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট? এ সকল অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন নহে-কিন্তু ধর্মের অপেক্ষা ন্যূন বটে। ধর্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম সতীত্ব। সেই জন্য বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর।"

ম। আমি অবলা; জ্ঞানহীনা; বিবশা; আমি ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

হে। সাবধান, মনোরমা! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্যন্ত হইয়াছে। তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না?

গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম ঝুলিতেছিল; মনোরমা চর্ম হস্তে লইয়া কহিল, "ভাই, হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া?"

হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন। মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ : গিরিজায়ার সংবাদ

গিরিজায়া যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন প্রাণান্তে হেমচন্দ্রের নবানুরাগের কথা মৃণালিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে না স্থির করিয়াছিল। মৃণালিনী তাহার আগমন প্রতীক্ষায় পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় চঞ্চলা হইয়া রহিয়াছিলেন; গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "বল গিরিজায়া, কি দেখিলে? হেমচন্দ্র কেমন আছেন?"

গিরিজায়া কহিল, "ভাল আছেন।"

মৃ। গিরিজায়া, আমাকে প্রতারণা করিও না; হেমচন্দ্র কি ভাল হয়েন নাই? তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। সন্দেহের অপেক্ষা প্রতীতি ভাল।

গিরিজায়া এবার সহাস্যে কহিল, "তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত হও? আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহার শরীরে কিছুই ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।"

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্তা শুনিলে?"

গি। শুনিলাম।

মৃ। কি শুনিলে?

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা কহিলেন। কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে যে মনোরমা নিশা পর্যটন করিয়াছিলেন ও কাণে কাণে কথা বলিয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় গোপন করিলেন। মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

গিরিজায়া কিছু ইতস্তত: করিয়া কহিল, "করিয়াছি।"

মৃ। তিনি কি কহিলেন?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৃ। তুমি কি বলিলে?

গি। আমি বলিলাম, তুমি ভাল আছ।

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্তত: করিয়া উত্তর দিতেছ, তোমার মুখ শুষ্ক। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না। আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, আমি স্বয়ং হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইব। পার, আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ আমি একাকিনী যাইব।

এই বলিয়া মৃণালিনী অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজায়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইল। কিছু দূর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, ফের; আমি যাহা লুকাইয়াছি, তাহার প্রকাশ করিতেছি।"

মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গিরিজায়া যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে ঠকাইয়াছিল; কিন্তু মৃণালিনীকে ঠকাইতে পারিল না।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ : মৃণালিনীর লিপি

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকেন, 'উত্তম হইয়াছে'; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন?"

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, "ইহা সম্ভব বটে।"

তখন মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। এর বিহিত করা উচিত; তুমি আহারাদি করিতে যাও। আমি ততক্ষণ একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি খাইবার পর, সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে।"

গিরিজায়া স্বীকৃতা হইয়া সত্বরে আহারাদির জন্য গমন করিল। মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন।

"গিরিজায়া মিথ্যাবাদিনী। যে কারণে সে তোমার নিকট মৎসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কহিবে। আমি মথুরায় যাই নাই। যে রাত্রিতে তোমার অঙ্গুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে আসিয়াছিলাম, সেই রাত্রি অবধি আমার পক্ষে মথুরার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে আসিয়াও যে এ পর্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার এক কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে। আমার অভিলাষ, তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্যক কি?"

গিরিজায়া এই লিপি লইয়া পুনরপি হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যাকালে, মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজায়া তাঁহার হস্তে লিপি দিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি আবার কেন?"

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি।

হে। পত্র কাহার?

গি। মৃণালিনীর পত্র।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, "এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল?"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মথুরার কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাঁহার?

গি। হাঁ, তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

হেমচন্দ্র লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ছিন্নখণ্ড সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্বেই শুনিতে পাইয়াছি। তুমি যে দুষ্টার পত্র লইয়া আসিয়াছ, সে যে বিবাহ করিতে যায় নাই, হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্বেই শুনিয়াছি। আমি কুলটার পত্র পড়িব না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

গিরিজায়া চমৎকৃত হইয়া নিরুত্তরে হেমচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র-বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হস্তে লইয়া কহিলেন, "দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।"

গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, "বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না-এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবদু:খীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু গিরিজায়ার রাগ গেল না। বলিল, "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।"

এই বলিয়া গিরিজায়া সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

গিরিজায়া প্রত্যাগতা হেমচন্দ্রের মৃণালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। এবার কিছু লুকাইল না। মৃণালিনী শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল-তখন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নহে বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল।

পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণী ছিল, তথায় গিয়া গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল। শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দনরহিত কুসুমশ্রেণী অর্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; চারি দিকে বৃক্ষমালা নি:শব্দে পরস্পরাশ্লিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দেশ করিতেছিল; ক্কচিৎ দুই একটি দীর্ঘ শাখা ঊর্ধ্বোত্থিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জমধ্য হইতে নবস্ফুটকুসুমসৌরভ আসিতেছিল। গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল।

গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল-যেন নবশিক্ষিতা বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতা লাভ করিতে লাগিল-ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে সেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কন্ঠধ্বনি, পুষ্করিণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গচ্যুত স্বরসরিত্তরঙ্গস্বরূপ মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিজায়া গায়িল-

"পরাণ না গেলো।

যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,

গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,

ওঁহি পর পিয় সই, কাহে কালো নীরে,

জীবন না গেলো?

ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,

তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,

রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি,

তইখন না গেলো?

শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,

রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে;

যব শুনন লাগি সই, সো মধু বোলি,

জীবন না গেলো?

ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে,

লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে,

সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি,

মরণ না ভেল?”

গিরিজায়া গায়িতে গায়িতে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে চন্দ্রের কিরণোপরি, মনুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী কাঁদিতেছেন।

গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন - তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যখন মৃণালিনীর চক্ষুতে জল আসিয়াছে - তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না - মনে করে, “কই, ইহার চক্ষুতে ত জল দেখিলাম না, তবে ইহার কিসের দু:খ?” যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্মপীড়াই না জানি নিবারণ হইত।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী কিছু বলিতে পারেন না; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। পরে মৃণালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, আর একবার তোমাকে যাইতে হইবে।”

গি। আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন?

মৃ। পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন-এ সংসারে অভ্রান্ত কে? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট এখনই যাইব-তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর-তুমি আমার জন্য না করিয়াছ কি? তুমি কখনও আমাকে অকারণে মন:পীড়া দিবে না-কখনও আমার নিকট এ সকল কথা মিথ্যা করিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না শুনিয়া কি প্রকারে অন্ত:করণকে স্থির করিতে পারি? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিব।

গি। প্রাণবিসর্জন! সে কি মৃণালিনী?

মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহুস্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।

## নবম পরিচ্ছেদ : অমৃতে গরল-গরলামৃত

হেমচন্দ্রের আচার্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৃণালিনীকে দুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন; মৃণালিনীর পত্র পাঠ না করিয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি মৃণালিনীকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। মৃণালিনীর জন্য তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী হইয়াছিলেন। এই মৃণালিনীর জন্য গুরুর প্রতি শরসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মৃণালিনীর জন্য গৌড়ে নিজ ব্রত বিস্মৃত হইয়া ভিখারিণীর তোষামোদ করিয়াছিলেন। আর এখন? এখন হেমচন্দ্র মাধবাচার্যকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব!” কিন্তু তাই বলিয়া কি, এখন তাঁহার স্নেহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল? স্নেহ কি একদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে? বহুদিন অবধি পার্বতীয় বারি পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত করে, একদিনের সূর্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায়? জলের যে পথ নিখাত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে, সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। হেমচন্দ্র সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে, শয্যোপরি শয়ন করিয়া সেই মুক্ত বাতায়নসন্নিধানে মস্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে দৃষ্টি করিতেছিলেন-তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতেছিলেন? যদি তাঁহাকে সে সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, রাত্রি সজ্যোৎস্না কি অন্ধকার, তাহা তিনি তখন সহসা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্না! নহিলে তাঁহার উপাধান আর্দ্র কেন? কেবল মেঘোদয় মাত্র। যাহার হৃদয়-আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন করে না।

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই-পরের সুখও কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মন:পীড়া সকল সহ্য করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্‌কালে, একদিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।

মৃণালিনী

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন - যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য রোদন করিতেছিলেন। মৃণালিনীর কি তিনি দোষ আলোচনা করিতেছিলেন? তাহা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এক একবার মৃণালিনীর প্রেমপরিপূরণ মুখমণ্ডল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ কার্যসকল মনে করিতেছিলেন। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী? একদিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত বাহক পাইলেন না; কিন্তু মৃণালিনীকে গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তখন হেমচন্দ্র একটি আম্রফলের উপরে আবশ্যক কথা লিখিয়া মৃণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাতায়নপথে প্রেরণ করিলেন; আম্র ধরিবার জন্য মৃণালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসাতে আম্র মৃণালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাঁহার কর্ণে লাগিল, অমনি তদাঘাতে কর্ণবিলম্বী রত্নকুণ্ডল কর্ণ ছিন্নভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল; কর্ণস্রুত রুধিরে মৃণালিনীর গ্রীবা ভাসিয়া গেল। মৃণালিনী ভ্রুক্ষেপও করিলেন না; কর্ণে হস্তও দিলেন না; হাসিয়া আম্র তুলিয়া লিপি পাঠপূর্বক, তখনই তৎপৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর লিখিয়া আম্র প্রতিপ্রেরণ করিলেন। এবং যতক্ষণ হেমচন্দ্র দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া হাস্যমুখে দেখিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের তাহা মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী? ইহা সম্ভব নহে। আর একদিন মৃণালিনীকে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণায় মৃণালিনী মুমূর্ষুবৎ কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার একজন পরিচারিকা তাহার উত্তম ঔষধ জানিত; তৎপ্রয়োগ মাত্র যন্ত্রণা একেবারে শীতল হয়; দাসী শীঘ্র ঔষধ আনিতে গেল। ইত্যবসরে হেমচন্দ্রের দূতী গিয়া কহিল যে, হেমচন্দ্র উপবনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মুহূর্তমধ্যে ঔষধ আসিত, কিন্তু মৃণালিনী তাহার অপেক্ষা করেন নাই; অমনি সেই মরণাধিক যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া উপবনে উপস্থিত হইলেন। আর ঔষধ প্রয়োগ হইল না। হেমচন্দ্রের তাহা স্মরণ হইল। সেই মৃণালিনী ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক ব্যোমকেশের জন্য হেমচন্দ্রের কাছে অবিশ্বাসিনী হইবে? না, তা কখনই হইতে পারে না। আর একদিন হেমচন্দ্র মথুরা হইতে গুরুদর্শনে যাইতেছিলেন; মথুরা হইতে এক প্রহরের পথ আসিয়া হেমচন্দ্রের পীড়া হইল। তিনি এক পান্থনিবাসে পড়িয়া রহিলেন; কোন প্রকারে এ সংবাদ অন্ত:পুরে মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণালিনী সেই রাত্রিতে এক ধাত্রীমাত্র সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে সেই এক যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। যখন মৃণালিনী পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তিতে প্রায় নির্জীব; চরণ ক্ষতবিক্ষত - রুধির বহিতেছিল। সেই রাত্রিতেই মৃণালিনী পিতার ভয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি স্বয়ং পীড়িতা হইলেন। হেমচন্দ্রের তাহাও মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী নরাধম ব্যোমকেশের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিবে? সে কি অবিশ্বাসিনী হইতে পারে? যে এমন কথায় বিশ্বাস করে, সেই অবিশ্বাসী-সে নরাধম, সে গণ্ডমূর্খ। হেমচন্দ্র শতবার ভাবিতেছিলেন, "কেন আমি মৃণালিনীর পত্র পড়িলাম না? নবদ্বীপে কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না?" পত্রখণ্ডগুলি যে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যদি যেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা যুক্ত করিয়া যতদূর পারেন, ততদূর মর্মাবগত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্যন্ত গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে বনতলস্থ অন্ধকারে কিছুই পায়েন নাই। বায়ু লিপিখণ্ডসকল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলে হেমচন্দ্র সেই লিপিখণ্ডগুলি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র তাহাও দিতেন।

আবার ভাবিতেছিলেন, "আচার্য কেন মিথ্যা কথা বলিবেন? আচার্য অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ-কখনও মিথ্যা বলিবেন না। বিশেষ আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন-জানেন, এ সংবাদে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হইবে, কেন আমাকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া এত যন্ত্রণা দিবেন? আর তিনিও স্বেচ্ছাক্রমে এ কথা বলেন নাই। আমি সদর্পে তাঁহার নিকট কথা বাহির করিয়া লইলাম-যখন আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি-তখনই তিনি কথা বলিলেন। মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, বলিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন?

তবে হইতে পারে, হৃষীকেশ তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া থাকিবে। কিন্তু হৃষীকেশই বা অকারণে গুরুর নিকট মিথ্যা বলিবে কেন? আর মৃণালিনীই বা তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিবে কেন?"

যখন এইরূপ ভাবেন, তখন হেমচন্দ্রের মুখ কালিমাময় হয়, ললাট ঘর্মসিক্ত হয়; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসেন; দন্তে অধর দংশন করেন, লোচন আরক্ত এবং বিস্ফারিত হয়; শূলধারণ জন্য হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। আবার মৃণালিনীর প্রেমময় মুখমণ্ডল মনে পড়ে। অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় শয্যায় পতিত হয়েন; উপাধানে মুখ লুক্কায়িত করিয়া শিশুর ন্যায় রোদন করেন। হেমচন্দ্র ঐরূপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরমা। তখনই দেখিলেন, সে কুসুমময়ী মূর্তি নহে। পরে চিনিলেন যে, গিরিজায়া। প্রথমে বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত শেষে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আবার কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি মৃণালিনীর দাসী। মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। সুতরাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে। আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিব, স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।"

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তোমার কোন শঙ্কা নাই। স্ত্রীলোককে আমি মারিব না। তুমি কেন আসিয়াছ? মৃণালিনী কোথায়? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন; নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন? আমি তাঁহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই।

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের শরীর কন্টকিত হইল। এই মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় আছেন?"

গি। তিনি আপানর নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। সরোবরতীরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি আসুন।

এই বলিয়া গিরিজায়া চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় মৃণালিনী সোপানোপরি বসিয়া ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। হেমচন্দ্রও তথায় আসিলেন। গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণী! উঠ। রাজপুত্র আসিয়াছেন।"

মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। মৃণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল; অশ্রুজলে চক্ষু পূরিয়া গেল। অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে যেমন শাখাবিলম্বিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন। গিরিজায়া অন্তরে গেল।

## দশম পরিচ্ছেদ : এত দিনের পর!

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এতকাল পরে দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। যে দিন প্রদোষকালে, যমুনার উপকূলে নৈদাঘানিলসন্তাড়িত বকুলমূলে দাঁড়াইয়া, নীলাম্বুয়ীর চঞ্চল-তরঙ্গ-শিরে নক্ষত্ররশ্মির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ

করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল। নিদাঘের পর বর্ষা গিয়াছে, বর্ষার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইঁহাদিগের হৃদয়মধ্যে যে কত দিন গিয়াছে, তাহা কি ঋতুগণনায় গণিত হইতে পারে?

সেই নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরে, দুইজনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারি দিকে সেই নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্ত লতাগুল্মবিশোভী বিশাল বিটপীসকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সম্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক-আকাশে, বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে-সর্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্যময়ী। সেই ধৈর্যময়ী প্রকৃতির প্রাসাদমধ্যে, মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন।

ভাষায় কি শব্দ ছিল না? তাঁহাদিগের মনে কি বলিবার কথা ছিল না? যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না? তখন চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ত-কথা কহিবে কি প্রকারে? এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকটে অবস্থিতিতে এত সুখ যে, হৃদয়মধ্যে অন্য সুখের স্থান থাকে না। যে সে সুখভোগ করিতে থাকে, সে আর কথার সুখ বাসনা করে না।

সে সময়ে এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন্ কথা আগে বলিব, তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মনুষ্যভাষায় এমন কোন্ শব্দ আছে যে, সে সময়ে প্রযুক্ত হইতে পারে?

তাঁহারা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন - হৃষীকেশবাক্যে প্রত্যয় দূর হইতে লাগিল। সে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ত পবিত্রতা লেখা আছে। হেমচন্দ্র তাঁহার লোচনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; সেই অপূর্ব আয়তনশালী, ইন্দীবর-নিন্দী, অন্ত:করণের দর্পণরূপ চক্ষুপ্রতি চাহিয়া রহিলেন-তাহা হইতে কেবল প্রেমাশ্রু বহিতেছে!-সে চক্ষু যাহার, সে কি অবিশ্বাসিনী!

হেমচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মৃণালিনী! কেমন আছ?”

মৃণালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই; উত্তরের উপক্রম করিলেন, কিন্তু আবার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। কন্ঠ রুদ্ধ হইল, কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন আসিয়াছ?”

মৃণালিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন না। হেমচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সোপানোপরি বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃণালিনীর যে কিছু চিত্তের স্থিরতা ছিল, এই আদরে তাহার লোপ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মস্তক আপনি আসিয়া হেমচন্দ্রের স্কন্ধে স্থাপিত হইল, মৃণালিনী তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। মৃণালিনী আবার রোদন করিলেন-তাঁহার অশ্রুজলে হেমচন্দ্রের স্কন্ধ, বক্ষ: প্লাবিত হইল। এ সংসারে মৃণালিনী যত সুখ অনুভূত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন সুখই এই রোদনের তুল্য নহে।

হেমচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, “মৃণালিনী! আমি তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিবার কতক কারণও ঘটিয়াছিল-তাহা তুমি দূর করিতে পারিবে। যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও |”

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের স্কন্ধ হইতে মস্তক না তুলিয়া কহিলেন, “কি?”

হেমচন্দ্র বলিলেন, “তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিলে কেন?”

ঐ নাম শ্রবণমাত্র কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মৃণালিনী মাথা তুলিল। কহিল, হৃষীকেশ আমাকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে।"

হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলেন-অল্প সন্দিহান হইলেন-কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। এই অবকাশে মৃণালিনী পুনরপি হেমচন্দ্রের স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন। সে সুখাসনে শিরোরক্ষা এত সুখ যে, মৃণালিনী তাহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমাকে হৃষীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল?"

মৃণালিনীকে হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুরবে কহিলেন, "তোমাকে কি বলিব? হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।"

শ্রুতমাত্র তীরের ন্যায় হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষশ্চ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল।

"পাপীয়সি-নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি!" এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে গিরিজায়াকে দেখিলেন; গিরিজায়া তাঁহার সজলজলদভীম মূর্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। লিখিতে লজ্জা করিতেছে-কিন্তু না লিখিলে নয়-হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপসৃতা করিলেন। বলিলেন, "তুমি যাহার দূতী, তাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

যাহার ধৈর্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্যমাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের নিপাত হইয়াছিল। "অশ্বত্থামা হত:" এই শব্দ শুনিয়া তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করিবেন। প্রশ্নান্তর দ্বারা সবিশেষ তত্ব লইলেন না। হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য নহে-অধৈর্য, অভিমান, ক্রোধ।

শীতল সমীরণময়ী ঊষার পিঙ্গল মূর্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল। তখনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন। গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে?"

মৃণালিনী কহিলেন, "কিসের আঘাত?

গি। মাথায়।

মৃ। মাথায় আঘাত? আমার মনে হয় না।

## চতুর্থ খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ : ঊর্ণনাভ

যতক্ষণ মৃণালিনীর সুখের তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গৌড়দেশের সৌভাগ্যশশীও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল। নিশীথ নিভৃতে বসিয়া ধর্মাধিকার পশুপতি, নিজ দক্ষিণহস্তস্বরূপ শান্তশীলকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, "শান্তশীল! প্রাতে যে সংবাদ দিয়াছ, কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা নাই।"

শান্তশীল কহিল, "যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই। অন্য কার্যে পরিচয় গ্রহণ করুন।"

প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে?

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ না সাজে।

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে?

শা। এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের নিকট হইতে কর লইয়া কয় জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে।

প। দামোদর শর্মা উপদেশানুযায়ী কার্য করিয়াছেন কি না?

শা। তিনি বড় চতুরের ন্যায় কার্য নির্বাহ করিয়াছেন।

প। সে কি প্রকার?

শা। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র পরিবর্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি বসাইয়াছিলেন। তাহা লইয়া অদ্য প্রাহ্ণে রাজাকে শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবাচার্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

প। কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়বিজেতার রূপবর্ণনা সবিস্তারে লিখিত আছে। সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

শা। করিয়াছিলেন। মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ মহারাজ অবগত আছেন। মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়জেতার অবয়ব বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মগধে যবন-রাজ-প্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছ?" সে কহিল, "আসিয়াছি|" মহারাজ তখন আজ্ঞা করিলেন, "সে দেখিতে কি প্রকার, বিবৃত কর |" তখন মদনসেন বখ্‌তিয়ার খিলিজির যথার্থ যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিলেন। কবিতাতেও সেইরূপ বর্ণিত ছিল। সুতরাং গৌড়জয় ও তাঁহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন।

প। তাহার পর?

শা। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিব? সপরিবারে যবনহস্তে প্রাণে নষ্ট হইব দেখিতেছি!" তখন দামোদর শিক্ষামত কহিলেন, "মহারাজ! ইহার সদুপায় এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্মাধিকারের প্রতি রাজকার্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, রাজ্য পুন:প্রাপ্ত হইবেন |" রাজা এ পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত পক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্যসিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে ত্রুটি করিব না, তাহা ত জান। এক্ষণে বিদায় হও। কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে।

শান্তশীল বিদায় হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিনা সূতার হার

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকায় বহু ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহ যাহাতে আলো হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার-এ সকলই তাঁহার গৃহে ছিল না।

অদ্য শান্তশীলের সহিত কথোপকথনের পর, পশুপতির সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, "এত কালের পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হইল-যদি জগদম্বা অনুকূলা হয়েন, তবে মনোরমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শয়নের পূর্বে অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণাম-বন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় মনোরমা বসিয়া আছে।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, কখন আসিলে?"

মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছিল। কথার কোন উত্তর দিল না। পশুপতি কহিলেন, "আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।"

মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, "আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।"

পশুপতি কহিলেন, "তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, "আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আমি এ বয়স পর্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি-বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ, তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এজন্য তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্যন্ত মনোরমা- লাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী অনুগ্রহ করেন, তবে দুই চারি দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, তুমি কুলীনকন্যা, জনার্দন শর্মা কুলীনশ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রিয়।"

মনোরমা এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেছিল কি না সন্দেহ। পশুপতি দেখিলেন যে, মনোরমা চিত্ত হারাইয়াছে। পশুপতি, সরলা অবিকৃতা বালিকা মনোরমাকে ভালবাসিতেন-প্রৌঢ়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মনোরমাকে ভয় করিতেন। কিন্তু অদ্য ভাবান্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তথাপি পুনরুদ্যম করিয়া পশুপতি কহিলেন, "কিন্তু কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে, কুলনাশে ধর্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না। তাঁহার অজ্ঞাতে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতিই কি? তুমি সম্মত হইলেই, তাহা পারি। পরে তোমার পিতামহ জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।"

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাসূত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল। পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা তখন আপন মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া, তৎসূত্রে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল।

পশুপতি উত্তর না পাইয়া নি:শব্দে মালাকুসুমমধ্যে মনোরমার অনুপম অঙ্গুলির গতি মুগ্ধলোচনে দেখিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিহঙ্গী পিঞ্জরে

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধিপ্রদীপ জ্বালিবার অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোৎপত্তি কঠিন হইল। পরিশেষে বলিলেন, "মনোরমা, রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমি শয়নে যাই|"

মনোরমা অম্লানবদনে কহিলেন, "যাও|"

পশুপতি শয়নে গেলেন না। বসিয়া মালা গাঁথা দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়ান্তর স্বরূপ, ভয়সূচক চিন্তার আবির্ভাবে কার্য সিদ্ধ হইবেক ভাবিয়া, মনোরমাকে ভীতা করিবার জন্য পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, যদি ইতিমধ্যে যবন আইসে, তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

মনোরমা মালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, "বাটীতে থাকিব|"

পশুপতি কহিলেন, "বাটীতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে?"

মনোরমা পূর্ববৎ অন্য মনে কহিল, "জানি না; নিরুপায়|"

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ?"

ম। দেবতা প্রণাম করিতে।

পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন-তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?"

মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল-সে তাহা একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জারের গলায় পরাইতেছিল। পশুপতির কথা কর্ণে গেল না। মার্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল-যতবার মনোরমা মালা তাহার গলায় দিতেছিল, ততবার সে মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল-মনোরমা কুন্দনিন্দিত দন্তে অধর দংশন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিল, আর আবার মালা তাহার গলায় দিতেছিল। পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন-বিড়াল ঊর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল।

মার্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল-কিন্তু দংশিতাধরা হাস্যময়ীর তৎকালীন অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন-অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল-পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।

পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণেক মনোরমার মুখপ্রতি চাহিতে পারিলেন না-পরে চাহিয়া দেখিলেন-মনোরমা প্রৌঢ়বয়:প্রফুল্লমুখী মহিমাময়ী সুন্দরী।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী-আমাকে বিবাহ কর।" মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, "পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায়?"

পশুপতি কহিলেন, "কেশবের মেয়ে কোথায় জানি না-জানিতেও চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্নী|"

ম। আমি জানি কেশবের মেয়ে কোথায়-বলিব?

পশুপতি অবাক হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বলিতে লাগিল, "একজন জ্যোতির্বিদ, গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই কথায় অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে বড়ই দু:খিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কস্মিন্‌কালে না পাইতে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল-এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে কেশব আচার্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, 'এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। ইহার স্বামী পশুপতি-কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্পবয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। অতএব আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী। অথবা পশুপতিকে কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাঁহার স্ত্রী।"

"আচার্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্যন্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।"

প। এখন সে কন্যা কোথায়?

ম। আমিই কেশবের মেয়ে-জনার্দন শর্মা তাঁহার আচার্য।

পশুপতি চিত্ত হারাইলেন; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া প্রতিমাসমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাত করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। মনোরমা পূর্ববৎ সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "এখন নয়-আরও কথা আছে।"

প। মনোরমা-রাক্ষসি! এতদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে?

ম। কেন! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে?

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিশ্বাস করিয়াছি? আর যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দন শর্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম।

ম। জনার্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন? তিনি শিষ্যের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন।

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন?

ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই। একদিন গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম। আরও আমি বিধবা বলিয়া পরিচিতা। তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে লোকে প্রত্যয় করিবে কেন? তুমি লোকের কাছে নিন্দনীয় না হইয়া কি প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে?

প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম।

ম। ভাল, তাহাই হউক-জ্যোতির্বিদের গণনা?

প। আমি গ্রহশান্তি করাইতাম। ভাল, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যদি আমি রত্ন পাইয়াছি, তবে আর তাহার গলা হইতে নামাইব না। তুমি আর আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মনোরমা কহিল, "এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি! আমি যাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি শুন। এ ঘর ছাড়। তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড় । এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন আমাদিগের আয়ু:শেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর-আমার ভক্তি অচল থাকিবে। নহিলে___"

প। নহিলে কি?

মনোরমা তখন উন্নতমুখে, সবাষ্পলোচনে, দেবীপ্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যুক্তকরে গদ্গদকণ্ঠে কহিল, "নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

পশুপতিও দেবীর সমক্ষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "মনোরমা-আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার থাকিলে আমি ফিরিতাম-তোমাকে লইয়া সর্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেকদূর গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই-যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি, তাহা আর খুলিতে পারি না-স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া কি আমার পরমসুখে আমি বঞ্চিত হইব? তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর-আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। মনোরমার চিত্তে সংশয় জন্মিল। সে চিন্তিতান্ত:করণে কিয়ৎক্ষণ মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার পশুপতর নিকট বিদায় না লইয়া যাইতে পারিল না।

অল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "প্রাণাধিকে! আজি আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

মনোরমা বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যবনদূত-যমদূত বা

বেলা প্রহরের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিতজাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের আকারেঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপবাসীরা ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট; তাহাদিগের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রু রাজিবিভূষিত; নয়ন প্রশস্ত, জ্বালাবিশিষ্ট। তাহাদিগের পরিচ্ছদ অনর্থক চাকচিক্যবর্জিত; তাহাদিগের যোদ্ধবেশ; সর্বাঙ্গে প্রহরণজালমণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর যে সকল সিন্ধুপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর! পর্বতশিলাখণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, বিমার্জিতদেহ, বক্রগ্রীব, বল্গা-রোধ-অসহিষ্ণু, তেজোগর্বে নৃত্যশীল! আরোহীরা কিবা তচ্চালন-কৌশলী-অবলীলাক্রমে সেই রুদ্ধবায়ুতুল্য তেজ:প্রখর অশ্ব সকল দমিত করিতেছে। দেখিয়া গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। কৌতূহলবশত: কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, "ইহারা যবনরাজার দূত।" এই বলিয়া ইহারা

প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল-এবং পশুপতির আজ্ঞাক্রমে সেই পরিচয়ে নির্বিঘ্নে নগরমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল-পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র-অল্পসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?"

যবনেরা উত্তর করিল, "আমরা যবন-রাজপ্রতিনিধির দূত; গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দৌবারিক কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর এক্ষণে অন্ত:পুরে গমন করিয়াছেন-এখন সাক্ষাৎ হইবে না।"

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্বাগ্রে একজন খর্বকায়, দীর্ঘবাহু, কুরূপ যবন। দুর্ভাগ্যবশত: দৌবারিক তাহার গতিরোধজন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "ফের-নচেৎ এখনই মারিব।"

"আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্ষুদ্রাকার যবন দৌবারিককে নিজকরস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "এক্ষণে আপন কার্য কর।" অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনের কটিবদ্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল এবং অশনিসম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগের আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না-অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না-মুহূর্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা-বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধবনিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে অসি দ্বারা ছিন্নমস্তক, অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

পৌরজন তুমুল আর্তনাদ করিয়া ইতস্তত: পলায়ন করিতে লাগিল। সেই ঘোর আর্তনাদ, অন্ত:পুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথা প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে-যবন আসিয়াছে?"

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, "যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।"

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুষ্কশরীর জলস্রোত:প্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। নিকটে রাজমহিষী ছিলেন-রাজা ভোজনপাত্রের উপর পড়িয়া যান দেখিয়া, মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন; কহিলেন, "চিন্তা নাই-আপনি উঠুন।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

মহিষী কহিলেন, "চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কী দ্বার দিয়া সোণারগাঁ যাত্রা করি।"

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কিদ্বারপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিনহাাজ্উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জাল ছিঁড়িল

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখ্তিয়ার খিলিজি ধর্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধর্মাধিকারের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার সহিত যবনের সন্ধিনিবন্ধ হইয়াছিল, তাহার ফলোৎপাদনের সময় উপস্থিত!

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া, কুপিতা মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া, কদাচিৎ উল্লসিত-কদাচিৎ শঙ্কিত চিত্তে যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। বখ্য়তিয়ার খিলিজি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহার অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভৃত্যবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বখ্দতিয়ার খিলিজি তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "পণ্ডিতবর! রাজসিংহাসন আরোহণের পথ কুসুমাবৃত নহে। এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্বদা পদে বিদ্ধ হয়|"

পশুপতি কহিলেন, "সত্য! কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহাদিগেরই বধ আবশ্যক। ইহারা নির্বিরোধী।"

বখ্পতিয়ার কহিলেন, "আপনি কি শোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার স্মরণে অসুখী হইতেছেন?"

পশুপতি কহিলেন, "যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য করিব। মহাশয়ও যে তদ্রূপ করিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই |"

ব। কিছুমাত্র সংশয় নাই। কেবলমাত্র আমাদিগের এক যাচ্ঞা আছে।

প। আজ্ঞা করুন।

ব। কুতব্ উদ্দীন গৌড়-শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই যে, ইসলামধর্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না। আপনাকে ইসলামধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

পশুপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলেন, "সন্ধির সময়ে এরূপ কোন কথা হয় নাই |"

ব। যদি না হইয়া থাকে, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আর এ কথা উত্থাপিত না হইলেও আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে। কেন না, এমন কখনও সম্ভবে না যে, মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।

প। আমি বুদ্ধিমান বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না বুঝিয়া থাকেন, এখন বুঝিলেন; আপনি যবনধর্ম অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন।

প। (সদর্পে) আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যবন-সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতনধর্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

ব। ইহা আপনার ভ্রম। যাহাকে সনাতন ধর্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ- উক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গলসাধন করুন।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই মাত্র এই যে, কার্যসিদ্ধি করিয়া নিবদ্ধ সন্ধি ছলক্রমে ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে, বলক্রমে করিবে। অতএব কপটের সহিত কাপট্য অবলম্বন না করিয়া দর্প করিয়া ভাল করেন নাই। তিনি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "যে আজ্ঞা। আমি আজ্ঞানুবর্তী হইব|"

বখনতিয়ার তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বখ্ তিয়ার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুর না হইতেন, তবে এত সহজে গৌড়জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।

বখ্তিয়ার কহিলেন, "ভাল, ভাল। আজ আমাদিগের শুভ দিন। এরূপ কার্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইসলামের ধর্মে দীক্ষিত করিবেন|"

পশুপতি দেখিলেন, সর্বনাশ! বলিলেন, "একবার মাত্র অবকাশ দিউন, পরিবারগণকে লইয়া আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব|"

বখ্েতিয়ার কহিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন|"

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল। পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "সে কি? আমি কি বন্দী হইলাম?"

বখহতিয়ার কহিলেন, "আপাততঃ তাহাই বটে!"

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিরুদ্ধ হইলেন। ঊর্ণনাভের জাল ছিঁড়িল-সে জালে কেবল সে স্বয়ং জড়িত হইল।

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। ঊর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয়-অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পিঞ্জর ভাঙ্গিল

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনোরমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি যবনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তশীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন।

পশুপতি যাইবামাত্র, মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পলায়নের উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিল না। অতি ঊর্ধ্বে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল; কিন্তু তাহা দুরারোহণীয়; তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্যশরীর নির্গত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; আর তাহা ভূমি হইতে এত উচ্চ যে, তথা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। মনোরমা উন্মাদিনী; সেই গবাক্ষপথেই নিষ্ক্রান্ত হইবার মানস করিল।

অতএব পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই মনোরমা পশুপতির শয্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ করিল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষরোহণ সুলভ হইল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া, মনোরমা গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ষ পর্যন্ত বাহির করিয়া দিল। গবাক্ষনিকটে উদ্যানস্থ একটি আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল। মনোরমা তাহা ধারণ করিল; এবং তখন পশ্চাদ্ভাগ গবাক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। কোমল শাখা তাহার ভরে নমিত হইল; তখন ভূমি তাহার চরণ হইতে অনতিদূরবর্তী হইল। মনোরমা শাখা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িল। এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জনার্দনের গৃহাভিমুখে চলিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ : যবনবিপ্লব

সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার নিষ্পীড়নে বাত্যাসন্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ, ভূরি ভূরি অশ্বারোহিগণে, ভূরি পদাতিদলে, ভূরি ভূরি খড়্গী, ধানুকী, শূলিসমূহসমারোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দ্বার রুদ্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

যবনেরা রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবনসকল আক্রমণ করিতে লাগিল। কোথায়ও বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথায়ও শঠতাপূর্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহপ্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্বক করিতে লাগিল। কেবল যুবতীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম।

শোণিতে গৃহস্থের গৃহসকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শোণিতে যবনসেনা রক্তচিত্রময় হইল। অপহৃত দ্রব্যজাতের ভারে অশ্বের পৃষ্ঠ এবং মনুষ্যের স্কন্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ডসকল ভীষণভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে দুলিতে লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলাসকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অশ্বের পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল হস্তীর বৃংহিত, যবনের জয়শব্দ. তদুপরি পীড়িতের আর্তনাদ। মাতার রোদন, শিশুর রোদন; বৃদ্ধের করুণাকাঙ্ক্ষা, যুবতীর কন্ঠবিদার।

যে বীরপুরুষকে মাধবাচার্য এত যত্নে যবনদমনার্থ নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা?

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে, হেমচন্দ্র রণোন্মুখ নহেন। একাকী রণোন্মুখ হইয়া কি করিবেন?

হেমচন্দ্র তখন আপন গৃহের শয়নমন্দিরে, শয্যোপরি শয়ন করিয়া ছিলেন। নগরাক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের শব্দ?”

দিগ্বিজয় কহিল, “যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে|”

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্যন্ত বখ্ তিয়ারকর্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের বৃত্তান্ত শুনেন নাই। দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, “নাগরিকেরা কি করিতেছে?”

দি। যে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে সে প্রাণ হারাইতেছে।

হে। আর গৌড়ীয় সেনা?

দি। কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? রাজা ত পলাতক। সুতরাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে।

হে। আমার অশ্বসজ্জা কর।

দিগ্বিজয় বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন?"

হে। নগরে।

দি। একাকী?

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটি করিলেন। ভ্রূকুটি দেখিয়া দিগ্বিজয় ভীত হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল।

হেমচন্দ্র তখন মহামূল্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এবং ভীষণ শূলহস্তে নির্ঝরিণীপ্রেরিত জলবিম্ববৎ সেই অসীম যবন-সেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যুদ্ধজন্য কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হয় নাই, সুতরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন ছিল না। যাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কোন যবন তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্যম করিল, সে তৎক্ষণাৎ মরিল।

হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু যবনেরা পূর্বেই বিজয়লাভ করিয়াছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "একটি একটি করিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িয়া কে অরণ্যকে নিষ্পত্র করিতে পারে? একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব? যবন যুদ্ধ করিতেছে না-যবনবধেই বা কি সুখ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।" হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দুইজন যবন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে, অপর যবনে সেই অবসরে গৃহস্থদিগের সর্বস্বান্ত করিয়া চলিয়া যায়। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্বে এক কুটীরমধ্য হইতে হেমচন্দ্র আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। যবনকর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তির আর্তনাদ বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন গৃহমধ্যে যবন নাই। কিন্তু গৃহমধ্যে যবনদৌরাত্ম্যের চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই, যাহা আছে তাহার ভগ্নাবস্থা, আর এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে। সে এ প্রকার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু আসন্ন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যবনভ্রমে কহিতে লাগিল, "আইস-প্রহার কর-শীঘ্র মরিব-মার-আমার মাথা লইয়া সেই রাক্ষসীকে দিও-আ:-প্রাণ যায়-জল! জল! কে জল দিবে!"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার ঘরে জল আছে?"

ব্রাহ্মণ কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, "জানি না-মনে হয় না-জল! জল! পিশাচী!-সেই পিশাচীর জন্য প্রাণ গেল!"

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জলদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিল, না! না! জল খাইব না! যবনের জল খাইব না।" হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যবন নহি, আমি হিন্দু, আমার হাতের জল পান করিতে পার। আমার কথায় বুঝিতে পারিতেছ না?"

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার আর কি উপকার করিব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কি করিবে? আর কি? আমি মরি! মরি! যে মরে তাহার কি করিবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার কেহ আছে? তাহাকে তোমার নিকট রাখিয়া যাইব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কে-কে আছে? ঢের আছে। তার মধ্যে সেই রাক্ষসী! সেই রাক্ষসী-তাহাকে বলিও-বলিও আমার অপ-অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

হে। কে সে? কাহাকে বলিব?

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, "কে সে পিশাচী! পিশাচী চেন না? পিশাচী মৃণালিনী-মৃণালিনী! মৃণালিনী-পিশাচী।"

ব্রাহ্মণ অধিকতর আর্তনাদ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী তোমার কে হয়?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মৃণালিনী কে হয়? কেহ না-আমার যম।"

হে। মৃণালিনী তোমার কি করিয়াছে?

ব্রা। কি করিয়াছে?-কিছু না-আমি-আমি তার দুর্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল-

হে। কি দুর্দশা করিয়াছ?

ব্রা। আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও।

হেমচন্দ্র পুনর্বার তাহাকে জলপান করাইলেন। ব্রাহ্মণ জলপান করিয়া স্থির হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

ব্রা। ব্যোমকেশ।

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। দন্তে অধর দংশন করিলেন। করস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। আবার তখনই শান্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিবাস কোথা?"

ব্রা। গৌড়-গৌড় জান না? মৃণালিনী আমাদের বাড়ীতে থাকিত।

হে। তার পর?

ব্রা। তার পর-তার পর আর কি? তার পর আমার এই দশা-মৃণালিনী পাপিষ্ঠা; বড় নির্দয়-আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। রাগ করিয়া আমার পিতার নিকট আমি তাহার নামে মিছা কলঙ্ক রটাইলাম। পিতা তাহাকে বিনাদোষে তাড়াইয়া দিলেন। রাক্ষসী-রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল।

হে। তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন?

ব্রা। কেন?-কেন? গালি-গালি দিই? মৃণালিনী আমাকে ফিরিয়া দেখিত না-আমি-আমি তাহাকে দেখিয়া জীবন-জীবন ধারণ করিতাম। সে চলিয়া আসিল, সেই-সেই অবধি আমার সর্বস্ব ত্যাগ, তাহার জন্য কোন্ দেশে-কোন্ দেশে না গিয়াছি-কোথায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি? গিরিজায়া-ভিখারীর মেয়ে-তার আয়ি বলিয়া দিল-নবদ্বীপে আসিয়াছে-নবদ্বীপে আসিলাম, সন্ধান নাই। যবন-যবন-হস্তে মরিলাম, রাক্ষসীর জন্য মরিলাম-দেখা হইলে বলিও-আমার পাপের ফল ফলিল।

আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে পরিশ্রমে একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। নির্বাণোন্মুখ দীপ নিবিল! ক্ষণপরে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ প্রাণত্যাগ করিল।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। আর যবন বধ করিলেন না-কোন মতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মৃণালিনীর সুখ কি?

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপানপ্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন-মৃণালিনী এখনও সেইখানে। পৃথিবীতে যাইবার আর স্থান ছিল না-সর্বত্র সমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া যত কিছু বলিলেন-মৃণালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল-গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামাইয়া স্নান করাইল। স্নান করিয়া মৃণালিনী আর্দ্রবসনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গিরিজায়া স্বয়ং ক্ষুধাতুরা হইল-কিন্তু গিরিজায়া মৃণালিনীকে উঠাইতে পারিল না-সাহস করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। সুতরাং নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃণালিনীকে দিল। মৃণালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল-ক্ষুধার অনুরোধে মৃণালিনীকে ত্যাগ করিল না।

এইরূপে পূর্বাচলের সূর্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। গিরিজায়া দেখিলেন যে, তখনও মৃণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইলেন। পূর্বরাত্রে জাগরণ গিয়াছে-এ রাত্রেও জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল না-বৃক্ষপল্লব সংগ্রহ করিয়া সোপানোপরি আপন শয্যা রচনা করিল। মৃণালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "তুমি ঘরে গিয়া শোও।"

গিরিজায়া মৃণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "একত্রে যাইব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি যাইতেছি।"

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিখারিণী দুই দণ্ড পাতা পাতিয়া শুইলে ক্ষতি কি? কিন্তু সাহস পাই ত বলি-রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল-তবে আর কার্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?

মৃ। গিরিজায়া-হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম-আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল-সে উঠিয়া বসিল। বলিল, "কি ঠাকুরাণি! তুমি এখনও বল-তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাঁহার দাসী-তবে আমি চলিলাম-আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই।"

মৃ। গিরিজায়া-যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই-আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র-আমার স্বামী; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুযত্নরচিত পর্ণশয্যা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল, "পাষণ্ড বলিব না?-একবার বলিব?" (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) "একবার বলিব?-দশবার বলিব" (আবার পল্লব নিক্ষেপ)-"শতবার বলিব" (পল্লব নিক্ষেপ)-"হাজারবার বলিব।" এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায়া বলিতে লাগিল, "পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?"

মৃ। সে আমারই দোষ-আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই-কি বলিতে কি বলিলাম।

গি। ঠাকুরাণি! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।

মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।

গি। কি দেখিলে?

মৃ। বেদনা।

গি। কেন হইল?

মৃ। মনে নাই।

গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে-তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন-কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, "মনে হয় না; বোধ হয় আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, "ঠাকুরাণি! এ সংসারে আপনি সুখী।"

মৃ। কেন?

গি। আপনি রাগ করেন না।

মৃ। আমিই সুখী-কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গি। তবে কিসে?

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

নবম পরিচ্ছেদ : স্বপ্ন

গিরিজায়া কহিল, "গৃহে চল।" মৃণালিনী বলিলেন, "নগরে এ কিসের গোলযোগ?" তখন যবনসেনা নগর মন্থন করিতেছিল।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল। গিরিজায়া বলিল, "চল, এই বেলা সতর্ক হইয়া যাই।" কিন্তু দুইজন রাজপথের নিকট পর্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায়ই নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সরোবর-সোপানে বসিলেন। গিরিজায়া বলিল, "যদি এখানে উহারা আইসে?"

মৃণালিনী নীরবে রহিলেন। গিরিজায়া আপনিই বলিল, "বনের ছায়ামধ্যে এমন লুকাইব-কেহ দেখিতে পাইবে না।"

উভয়ে আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন।

মৃণালিনী ম্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া, বুঝি আমার যথার্থই সর্বনাশ উপস্থিত হইল।"

গি। সে কি!

মৃ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল; ইনি হেমচন্দ্র। সখি-নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে; যদি নি:সহায় প্রভু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন-না জানি কি বিপদে পড়িবেন!

গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিদ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।

মৃণালিনীও, একে আহারনিদ্রাভাবে দুর্বলা-তাহাতে সমস্ত রাত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না-তাঁহারও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্বসমরে বিজয়ী হইয়াছেন। মৃণালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাৎ, কত হস্তী, অশ্ব, পদাতি যাইতেছে। মৃণালিনীকে যেন সেই সেনাতরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল-তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভু! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।" হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, "আর কখন তোমায় ত্যাগ করিব না।" সেই কণ্ঠসবরে যেন-

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না" জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন-কি দেখিলেন? যাহা দেখিলেন, তাহা বিশ্বাস হইল না। আবার দেখিলেন সত্য! হেমচন্দ্র সম্মুখে! হেমচন্দ্র বলিতেছেন-"আর একবার ক্ষমা কর-আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

নিরভিমানিনী, নির্লজ্জা মৃণালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ : প্রেম-নানা প্রকার

আনন্দাশ্রুপ্লাবিত-বদনা মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে ধরিয়া উপবন-গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে একবার অপমানিতা, তিরস্কৃতা, ব্যথিতা করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আবার আপনি আসিয়াই তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন,-ইহা দেখিয়া গিরিজায়া বিস্মিতা হইল, কিন্তু মৃণালিনী একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটি কথাও কহিলেন না।

আনন্দপরিপ্লববিবশা হইয়া বসনে অশ্রুস্রুতি আবৃত করিয়া চলিলেন। গিরিজায়াকে ডাকিতে হইল না-সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবনবাটিকায় মৃণালিনী আসিলে, তখন উভয়ে বহুদিনের হৃদয়ের কথা সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন হেমচন্দ্র, যে যে ঘটনায় মৃণালিনীর প্রতি তাঁহার চিত্তের বিরাগ হইয়াছিল আর যে যে কারণে সেই বিরাগের ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। তখন মৃণালিনী যে প্রকারে হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। তখন উভয়েই হৃদয়ের পূর্বোদিত কত ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন উভয়েই কত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন; তখন কতই নূতন নূতন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন উভয়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কত কথাই অতি প্রয়োজনীয় কথার ন্যায় আগ্রহ সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন কতবার উভয়ে মোক্ষোন্মুখ অশ্রুজল কষ্টে নিবারিত করিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন; সে হাসির অর্থ "আমি এখন কত সুখী!" পরে যখন প্রভাতোদয়সূচক পক্ষিগণ রব করিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, আজি এখনই রাত্রি পোহাইল কেন?-আর সেই নগরমধ্যে যবনবিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বীচিরববৎ উঠিতেছিল-আজ হৃদয়সাগরের তরঙ্গরবে সে রব ডুবিয়া গেল।

উপবন-গৃহে আর এক স্থানে আর একটা কাণ্ড হইয়াছিল। দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রি জাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল, মৃণালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া চিনিল। মৃণালিনী তাহার নিকট অপিরিচিতা ছিলেন না-যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা সম্ভাবনা নাই, কি করে? ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল দেখিয়া দিগ্বিজয় মনে ভাবিল "বুঝিয়াছি-ইহারা দুইজন গৌড় হইতে আমাদিগের দুইজনকে দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছেন, আর এটা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই।" এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গোঁপদাড়ি চুমরিয়া লইল, এবং ভাবিল, "না হবে কেন?" আবার ভাবিল, "এটা কিন্তু বড়ই নষ্ট-একদিনের তরে কই আমাকে ভাল কথা বলে নাই-কেবল আমাকে গালিই দেয়-তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল-প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটুকু শুই। দেখি, পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়া নেয় কি না?" ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি ত মৃণালিনীর দাসী-মৃণালিনী এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন-তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম করিবার অধিকার আমারই।" এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল-মনে বড় আনন্দ হইল-তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে। দেখি, গিরিজায়া কি বলে? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়াই রহিল। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম দাম করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আ: মলো, ঘরগুলায় ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ-এ কি? এক মিন্‌সে! চোর না কি? মলো মিন্‌সে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার সম্মার্জনীর আঘাত। দিগ্বিজয়ের পিট ফাটিয়া গেল।

"ও গিরিজায়া, আমি! আমি!"

"আমি! আরে তুই বলিয়াই ত খাঙ্গরা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।" এই বলিবার পর আবার বিরাশি সিক্কা ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

"দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া! আমি দিগ্বিজয়!"

"আবার চুরি করিতে এসে-আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিন্‌সে!" ঝাঁটার বেগ আর থামে না।

দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল, "গিরিজায়া, আমাকে ভুলিয়া গেলে?"

গিরিজায়া বলিল, "তোর আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্‌সে?"

দিগ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই - রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। গিরিজায়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ : পূর্ব পরিচয়

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। গিরিজায়া আসিয়া মৃণালিনীর নিকট বসিল।

গিরিজায়া মৃণালিনীর দু:খের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া দু:খের সময় দু:খের কাহিনী সকল শুনিয়াছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা-উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দু:খের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না; আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃণালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল।

যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এতদিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্য?"

মৃ। এতদিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্য প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, এজন্য প্রকাশ করিতেছি।

গি। ঠাকুরাণি! সকল কথা বল না? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।

তখন মৃণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার পিতা একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী। তিনি অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন-মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখিত্ব ছিল।

আমি একদিন মথুরায় রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমুনার জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে তখন চিনিতাম না-তিনিই হেমচন্দ্র। তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন। জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান! হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন না। তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচয় লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবস পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না। এরূপ দুর্দিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। সুতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে - উভয়ের অন্ত:করণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমার বয়স পনের বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম না। হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুরাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি

বলিলেন, বিবাহ কর।' সুতরাং আমারও বোধ হইল, ইহা অবশ্য কর্তব্য। চতুর্থ দিবসে, দুর্যোগের উপশম দেখিয়া উপবাস করিলাম; দিগ্বিজয় উদ্যোগ করিয়া দিল। তীর্থপর্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।"

গি। কন্যা সম্প্রদান করিল কে?

মৃ। অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; আমার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। আমি তাঁহার নাম করিলাম। দিগ্বিজয় কোন ছলে পুরমধ্যে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। অরুন্ধতী মনে জানিতেন, আমি যমুনায় ডুবিয়া মরিয়াছি। তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহ্লাদিত হইলেন যে, আর কোন কথাতেই অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসী সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অদ্য তুমি জানিলে।

গি। মাধবাচার্য জানেন না?

মৃ। না, তিনি জানিলে সর্বনাশ হইত। মগধরাজ তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ, মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শত্রু।

গি। ভাল, তোমার বাপ যদি তোমাকে এ পর্যন্ত কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই কেন?

মৃ। বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া সুকঠিন; কেন না, বৌদ্ধধর্ম প্রায় লোপ হইয়াছে। পিতা বৌদ্ধ জামাতা চাহেন, অথচ সুপাত্র চাহেন। এরূপ একটি পাওয়া গিয়াছিল, সে আমার বিবাহের পর। বিবাহের দিন স্থির হইয়া সকল উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেই সময়ে জ্বর করিয়া বসিলাম। পাত্র অন্যত্র বিবাহ করিল।

গি। ইচ্ছাপূর্বক জ্বর করিয়াছিলে?

মৃ। হাঁ, ইচ্ছাপূর্বক। আমাদিগের উদ্যানে একটি কূয়া আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না। তাহার পানে বা স্নানে নিশ্চিত জ্বর। আমি রাত্রিতে গোপনে সেই জলে স্নান করিয়াছিলাম।

গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে?

মৃ। সন্দেহ কি? নচেৎ হেমচন্দ্রের নিকট পলাইয়া যাইতাম।

গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ। স্ত্রীলোক হইয়া কাহার সহায়ে পলাইতে?

মৃ। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন। যখন তিনি তথায় না থাকিতেন, তখন দিগ্বিজয় তথায় তাঁহার দোকান রাখিত। দিগ্বিজয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, যখন আমি যেরূপ আজ্ঞা করিব, সে তখনই সেরূপ করিবে। সুতরাং আমি নি:সহায় ছিলাম না।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বলিল, "ঠাকুরাণি! আমি একটি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমাকে মার্জনা করিতে হইবে। আমি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত আছি।"

মৃ। কি এমন গুরুতর কাজ করিলে?

গি। দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম, ওটা অতি অপদার্থ। এজন্য আমি তাহাকে ভালরূপে ঘা কত ঝাঁটা দিয়াছি। তা ভাল করি নাই।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিল, "তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

গি। ভিখারীর মেয়ের কি বিবাহ হয়?

মৃ। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

গি। তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব-আর কি করি?

মৃণালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আজি তোমার গায়ে হলুদ দিব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পরামর্শ

হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আচার্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কি আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি, এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব বিধিলিপি! নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড়জয় করিল কি প্রকারে? যদি, এখন এই দেহ পতন করিলে, একদিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে এই ক্ষণে তাহা করিতে আছি। সেই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে যুদ্ধের আশায় নগরমধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম-কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এক পক্ষ আক্রমণ করিতেছে-অপর পক্ষ পলাইতেছে।"

মাধবাচার্য কহিলেন, "বৎস! দু:খিত হইও না। দৈবনির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন; তাঁহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহার অল্পই সম্ভাবনা।"

মাধবাচার্য কহিলেন, "জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে। পূর্বদেশে যবন পরাভূত হইবে-ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব নহে-কামরূপই পূর্ব। বোধ হয়, তথায়ই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে।"

হে। কিন্তু এক্ষণে ত যবনের কামরূপ যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না।

মা। এই যবনেরা ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে ইহারা সুস্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে।

হে। তাহাও মানিলাম। এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সদুপায় হইল?

মা। এই যবনেরা এ পর্যন্ত পুন:পুন: জয়লাভ থরিয়া অজেয় বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না। তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্যবংশীয় রাজারা ধৃতাস্ত্র হইয়া উঠিবেন। সকলে এক হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে যবনেরা কত দিন তিষ্ঠিবে?

হে। গুরদেব! আপনি আশামাত্রের আশ্রয় লইতেছেন; আমিও তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব-আজ্ঞা করুন।

মা। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্তব্য; কেন না, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা-তুমি অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে।

হে। কোথায় যাইব?

মা। আমার সঙ্গে কামরূপ চল।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মৃদু মৃদু কহিলেন, "মৃণালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন?"

মাধবাচার্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি! আমি ভাবিতেছিলাম যে, তুমি কালিকার কথায় মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দূর করিয়াছিলে?"

হেমচন্দ্র পূর্বের ন্যায় মৃদুভাবে বলিলেন, "মৃণালিনী অত্যাজ্যা। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী |"

মাধবাচার্য চমৎকৃত হইলেন। রুষ্ট হইলেন। ক্ষোভ করিয়া কহিলেন, "আমি ইহার কিছু জানিলাম না?"

হেমচন্দ্র তখন আদ্যোপান্ত তাঁহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য কিছুক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। কহিলেন, "যে স্ত্রী অসদাচারিনী, সে তো শাস্ত্রানুসারে ত্যাজ্যা। মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা কালি প্রকাশ করিয়াছি।

তখন হেমচন্দ্র ব্যোমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "বৎস! বড় প্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবঙ্গ গুণবতী ভার্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্মাচরণ কর। যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি। যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর-অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও |"

এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের নিকট বিদায় হইলেন। মাধবাচার্য আশীর্বাদ, আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত

যে রাত্রে রাজধানী যবন-সেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতেছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে সেনাবিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল। মহম্মদ আলি তখন তাঁহার সম্ভাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন, "যবন!-প্রিয় সম্ভাষণে আর আবশ্যকতা নাই। একবার তোমারই প্রিয়সম্ভাষণে বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি। বিধর্মী যবনকে বিশ্বাস করিবার যে

ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়াছি। তোমাদিগের কোন প্রিয়সম্ভাষণ শুনিব না।"

মহম্মদ আলি কহিল, "আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করি-প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে হইবে।"

পশুপতি কহিলেন, "সে বিষয়ে চিত্ত স্থির করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি-কিন্তু যবনধর্ম অবলম্বন করিব না।"

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোষাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য ম্লেচ্ছের বেশ পরিব?

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্বক না পারিলে, আপনাকে বলপূর্বক পরাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

প। কোথায় যাইব?

ম। আপনি বন্দী-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

মহম্মদ আলি তাঁহাকে সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন। যে ব্যক্তি পশুপতির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচয় দিলেন; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন জনে কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন যবনসেনা নগরমন্থন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল; সুতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কহিলেন, "ধর্মাধিকার! আপনি আমাকে বিনা দোষে তিরস্কার করিয়াছেন। বখ্ তিয়ার খিলিজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে-আপনি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এইখান হইতে বিদায় হই।"

পশুপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবাক হইয়া রহিলেন। মহম্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "আপনি এই রাত্রিমধ্যে এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে যবনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটিবে। খিলিজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিলাম-ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম। ইহাকেও আপনার নৌকায় লইয়া যাইবেন।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন। পশুপতি কিয়ৎকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : ধাতুমূর্তির বিসর্জন

মহম্মদ আলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীরে চলিলেন-যবনের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতপদক্ষেপণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে

আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতি পদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতি পদে শোণিতসিক্ত কর্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য-বহু গৃহ ভস্মীভূত; কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন-গবাক্ষ ভগ্ন-প্রকোষ্ঠ ভগ্ন-তদুপরি মৃতদেহ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণ-যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাত্র বটে-কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন? যবন তাঁহাকে ধৃত করুক-অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক-মনে করিলেন ফিরিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন-কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশপ্রতি চাহিলেন। গগনের নক্ষত্র-চন্দ্র-গ্রহমণ্ডলীবিভূষিত সহাস্য পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে সহিল না-তীব্র জ্যোতি:সম্পীড়িতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল-অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বিলীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন-এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিস্রুত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কন্টকিতকলেবরে পুনরুত্থান করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না-দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িল-তাঁহার নিজবাটী? তাহা কি যবনহস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণ-পুত্তলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কি হইয়াছে? মনোরমার কি দশা হইয়াছে? তাঁহার প্রাণাধিকা, তাঁহাকে পাপ পথ হইতে পুন: পুন: নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যবনসেনাপ্রবাহ সে কুসুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবাভিমুখে ছুটিলেন। আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে-জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে।

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যবনেরা তাঁহার পৌরজন সহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই।

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করে। আপন বিকল চিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিলেন। হলাহল-কলস পরিপূর্ণ হইল-হৃদয়ের শেষ তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে দহ্যমান অট্টালিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন-মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ অল্পক্ষণ বিকলশরীরে অবস্থিতি করিলেন-শেষে মহাবেগে সেই অনলতরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

মহাবেগে পশুপতি জ্বলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল- অঙ্গ দগ্ধ হইল-কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়কক্ষে গমন করিলেন-কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধশরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল-তাহাতে তিনি বাহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ডসকল অগ্নিকর্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দগ্ধ গৃহাংশসকল অশনিসম্পাতশব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূমে, ধূলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

দাবানল সংবেষ্টিত আরণ্য গজের ন্যায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্তত: দাসদাসী স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না-হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, "মা! জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমায় পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম-ঐ পদধ্যান

ইহজন্মে সার করিয়াছিলাম-এখন, মা, এক দিনের পাপে সর্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?"

মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ! ধাতুমূর্তি!-তুমি ধাতুমূর্তি মাত্র, দেবী নহ-ঐ দেখ অগ্নি গর্জিতেছে! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে-সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীর্তি রাখিতে দিব না-আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম-আমিই তোমাকে বিসর্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গা জলে বিসর্জন করিব।"

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জিয়া উঠিল। তখনই পর্বতবিদারণরূপ প্রবল শব্দ হইল,-দগ্ধ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধূমভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতি সজীবন সমাধি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : অন্তিমকালে

পশুপতি স্বয়ং অষ্টভূজার অর্চনা করিতেন বটে-কিন্তু তথাপি তাঁহার নিত্যসেবার জন্য দুর্গাদাস নামে এক জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগরবিপ্লবের পরদিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভূজার মূর্তি ভস্ম হইতে উদ্ধার করিয়া আপন গৃহে স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যবনেরা নগর লুঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখতিয়ার খিলিজি অনর্থক নগরবাসীদিগের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহস করিয়া বাঙ্গালীরা রাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস অপরাহ্নে অষ্টভূজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিয়া, যথায় দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন, অনেক ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না করিলে, দেবীর প্রতিমা বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টক সকল অর্ধ দ্রবীভূত হইয়া পরস্পর লিপ্ত হইয়াছিল-এবং এখন পর্যন্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুত্রে এক দীর্ঘিকা হইতে জল বহন করিয়া তপ্ত ইষ্টকসকল শীতল করিলেন, এবং বহুকষ্টে তন্মধ্য হইতে অষ্টভূজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্কৃতা হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে-এ কি? সভয়ে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন যে, মনুষ্যের মৃতদেহ রহিয়াছে! তখন উভয়ে মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, পশুপতির দেহ।

বিস্ময়সূচক বাক্যের পর দুর্গাদাস কহিলেন, "যে প্রকারেই প্রভুর এ দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এবঞ্চ প্রতিপালিতের কার্য আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। গঙ্গাতীরে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুর সৎকার করি চল।"

এই বলিয়া দুইজনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দুর্গাদাস নগরে কাষ্ঠাদি সৎকারের উপযোগী সামগ্রীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন দুর্গাদাস পুত্রের আনুকূল্যে যথাশাস্ত্র দাহের পূর্বগামী ক্রিয়াসকল সমাপন করিয়া সুগন্ধি কাষ্ঠে চিতা রচনা করিলেন। এবং তদুপরি পশুপতির মৃতদেহ স্থাপন করিয়া অগ্নিপ্রদান করিতে গেলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্রাহ্মণদ্বয় বিস্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িতকুন্তলা, ভস্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে। রমণী ব্রাহ্মণদিগের নিকটবর্তিনী হইলেন।
দুর্গাদাস সভয়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

রমণী কহিলেন, “তোমরা কাহার সৎকার করিতেছ?”

দুর্গাদাস কহিলেন, “মৃত ধর্মাধিকার পশুপতির।”

রমণী কহিলেন, “পশুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল?”

দুর্গাদাস কহিলেন, “প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যবনকর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়া কোন সুযোগে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন। অদ্য তাঁহার অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, ভস্মমধ্য হইতে অষ্টভূজার প্রতিমা উদ্ধার মানসে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া প্রভুর মৃতদেহ পাইলাম।”

রমণী কোন উত্তর করিলেন না। গঙ্গাতীরে, সৈকতের উপর উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে?” দুর্গাদাস কহিলেন, “আমরা ব্রাহ্মণ; ধর্মাধিকারের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আপনি কে?”

তরুণী কহিলেন, “আমি তাঁহার পত্নী।”

দুর্গাদাস কহিলেন, “তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্দিষ্টা। আপনি কি প্রকারে তাঁহার পত্নী? “

যুবতী কহিলেন, “আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা। অনুমরণ ভয়ে পিতা আমাকে এতকাল লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পূরাইবার জন্য আসিয়াছি।”

শুনিয়া পিতাপুত্রে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন, “এখন স্ত্রীজাতির কর্তব্য কাজ করিব। তোমরা উদ্যোগ কর।”

দুর্গাদাস তরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন; পুত্রের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল?”

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। দুর্গাদাস তখন তরুণীকে কহিলেন, “মা, তুমি বালিকা-এ কঠিন কার্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ?”

তরুণী ভ্রুভঙ্গী করিয়া কহিলেন, “ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন? - ইহার উদ্যোগ

কর।”

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজন জন্য নগরে পুনর্বার চলিলেন। গমনকালে বিধবা দুর্গাদাসকে কহিলেন, “তুমি নগরে যাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবন বাটিকায় হেমচন্দ্র নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও, মনোরমা চিতারোহণ করিতেছে-তিনি আসিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন, তাঁহার নিকটে ইহলোকে মনোরমার এই মাত্র ভিক্ষা।”

হেমচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণমুখে শুনিলেন যে, মনোরমা পশুপতির আত্মপরিচয়ে তাঁহার অনুমৃতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসের সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার অতি মলিনা, উন্মাদিনী মূর্তি, তাঁহার স্থিরগম্ভীর, এখনও অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর জল আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “মনোরমা! ভগিনি! এ কি এ?”

তখন মনোরমা জ্যোতিস্নাপ্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থির মূর্তিতে মৃদুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, “ভাই, যে জন্য আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।”

মনোরমা সংক্ষেপে অন্যের শ্রবণাতীত স্বরে হেমচন্দ্রের নিকট পূর্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার স্বামী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠ যবনে তাহা ভোগ করিবে। তাহার অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনার্দন শর্মাকে কাশীধামে স্থাপন করিবে। জনার্দনকে অধিক ধন দিও না। তাহা হইলে যবনে কাড়িয়া লইবে। আমার দাহের পর, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের সন্ধান করিও। আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁড়িলেই তাহা পাইবে। আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে না।" এই বলিয়া মনোরমা যথা অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন। জনার্দনকে ও তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হেমচন্দ্রের দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট কত স্নেহসূচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন।

পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন। এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমাল্য কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্য উপবেশন করিয়া, নিদাঘসন্তপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।

## পরিশিষ্ট

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার কিয়দংশ জনার্দনকে দিয়া তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্তব্য কিনা, তাহা মাধবাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য বলিলেন, "এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখ্তিয়ার খিলিজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য; এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণও উচিত। দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আমার পরামর্শ যে, তুমি এই ধনের দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর, এবং তথায় যবনদমনোপযোগী সেনা সৃজন কর। তৎসাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাতসিদ্ধ করিও।"

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন। মৃণালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয় তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মাধবাচার্যও হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রাজ্যসংস্থাপন অতি সহজ কাজ হইয়া উঠিল; কেন না, যবনদিগের ধর্মদ্বেষিতায় পীড়িত এবং তাঁহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

মাধবাচার্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইল। এই রূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল। অচিরাৎ রমণীয় রাজপুরী নির্মিত হইল। মৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন। গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের পরিণয় হইল। গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিচর্যায় নিযুক্তা রহিলেন, দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের কার্য পূর্ববৎ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যে দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দু:খিত ছিলেন, এমন নহে। বরং একদিন কোন দৈবকারণবশত: গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণ বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না কি?" বস্তুত: ইহারা যাবজ্জীবন পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিল।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখ্তিয়ার খিলিজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিল। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল "সই" "সই" রহিল।

মৃণালিনী মাধবাচার্যের দ্বারা হৃষীকেশকে অনুরোধ করাইয়া মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী রাজপুরী মধ্যে মৃণালিনীর সখীর স্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।

শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্যে নিযুক্ত হইল।

মৃণালিনী